আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল ■ বর্ষ ১ ■ সংখ্যা ৭ ■ নভেম্বর ২০২৬ www.al-ummah.org

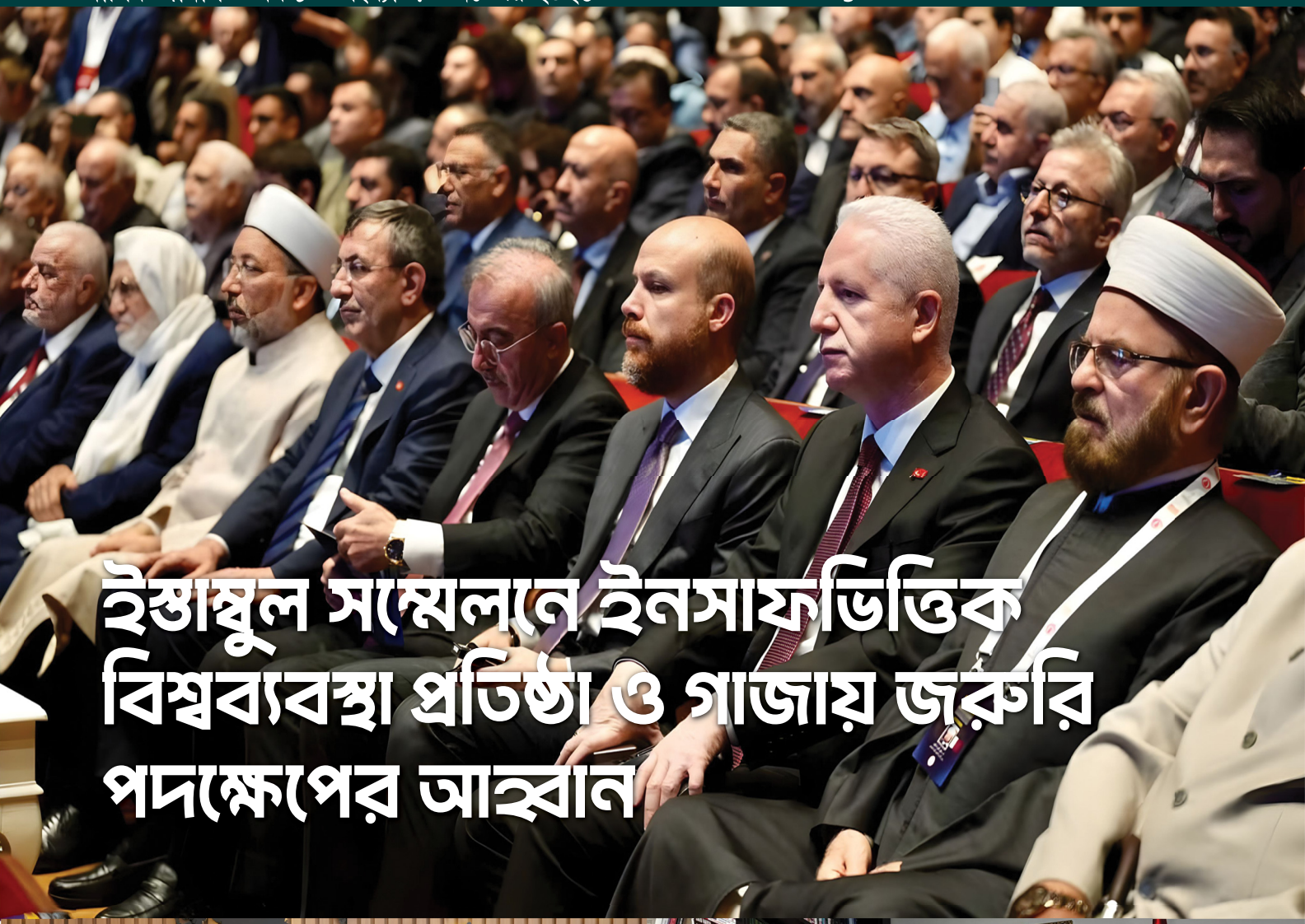

ইস্তাম্বুল সম্মেলনে ইনসাফভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও গাজায় জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান





বৈশ্বিক লক্ষ্য নিয়ে আঙ্কারায় আল-উম্মাহ

আল-উম্মাহ
www.al-ummah.org

প্রবন্ধ জমাদানের নির্দেশিকা

আল-উম্মাহ এমন সু-লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানায় যা গভীরতা, স্পষ্টতা এবং বিশ্লেষণধর্মী দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সুসংগঠিত বিশ্লেষণ ও শক্তিশালী প্রেক্ষাপটগত বোঝাপড়া থাকতে হবে। আমরা বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, মুসলিম বিশ্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিস্তৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর নিয়ে অবদান আহ্বান করি। জমা দেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত শর্তাবলী লক্ষ্য করুন:

- প্রবন্ধটি ১,০০০ থেকে ১,৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে এবং পরিষ্কার ও পরিমার্জিত বাংলায় লেখা থাকতে হবে।
- এতে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত মতামত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
- এটি অবশ্যই মৌলিক এবং পূর্বে অপ্রকাশিত হতে হবে। তথ্যের যথার্থতা, যথাযথ সূত্র প্রদান এবং বৌদ্ধিক সততা বজায় রাখার দায়িত্ব লেখকের।
- জমা দেওয়া সকল লেখা সম্পাদকীয় পর্যালোচনার আওতায় যাবে।
- স্পষ্টতা, শৈলী এবং দৈর্ঘ্যের জন্য প্রবন্ধ সম্পাদনার অধিকার আল-উম্মাহ সংরক্ষণ করে।
- প্রকাশ নিশ্চিত নয়।
- জমা দেওয়ার সময় লেখকের পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তর্ভুক্ত করুন।
- জমা পাঠানোর ঠিকানা: info@al-ummah.org

কপিরাইট নোটিশ

আল-উম্মাহ ওয়েবসাইট এবং এর মুদ্রিত ও ডিজিটাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তু প্রযোজ্য কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের বৌদ্ধিক সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত।

অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, এই প্রকাশনার কোনো অংশ পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ, বা কোনোভাবে প্রেরণ করা যাবে না– তা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে হোক না কেন।

লেখা জমা দেওয়ার মাধ্যমে লেখক স্বীকার ও সম্মত হন যে, গ্রহণ ও প্রকাশের পর প্রকাশিত উপাদানের কপিরাইট আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে থাকবে। পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকের নিজস্ব এবং তা ফাউন্ডেশনের মতামতের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে মিল নাও থাকতে পারে।

সংকটের দাবানলে উন্নত ভবিষ্যতের প্রত্যাশা

বিশ্বজুড়ে চলমান ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আরব উপদ্বীপে নতুন একটি যুদ্ধক্ষেত্রের সূচনা–বিশেষ করে সৌদি আরবে ইরান-সমর্থিত হুথি গোষ্ঠীর হামলা ও দুই পবিত্র মসজিদের নগরীগুলোকে লক্ষ্য করে চালানো বিমান হামলার প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। তা সত্ত্বেও, এ সংখ্যায় আমরা বিশ্বের ইতিবাচক অগ্রগতি এবং 'আল-উম্মাহ' দলের আশাব্যঞ্জক উদ্যোগগুলোর ওপরই আলোকপাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব উদ্যোগ এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়।

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসাইনের জন্য চলতি মাসটি ছিল অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং এর কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার অংশ হিসেবে তিনি বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম ও উচ্চপর্যায়ের জনপরিচিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বৈঠক করেন।

গত ৪ থেকে ৬ অক্টোবর ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয় 'ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি সিম্পোজিয়াম'। 'বৈশ্বিক সংকটের কোরআনভিত্তিক সমাধান' শীর্ষক এই সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের ফাঁকেই বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটিও এই মূল প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে।

পরবর্তীতে মোহাম্মদ জাকির হোসাইন আঙ্কারা সফর করেন। সেখানে তিনি দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব–ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউটের সভাপতি অধ্যাপক ড. সেলিম এরগুন এবং খ্যাতনামা তুর্কি লেখক অধ্যাপক ড. ইয়াসিন আকতাইয়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকগুলো অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। উভয় ব্যক্তিত্বই আল-উম্মাহর নানা উদ্যোগের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে তা তরুণ প্রজন্ম ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁরা মুহাম্মদ জাকিরের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যময় সমাজের মধ্যে সংলাপ জোরদার করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, একাডেমিক সংস্থা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সফর নিয়ে চলতি সংখ্যায় 'আল-উম্মাহ আঙ্কারায় তুলে ধরল তার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন

তাছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যময় সমাজের মধ্যে সংলাপ জোরদার করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, একাডেমিক সংস্থা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সফর নিয়ে চলতি সংখ্যায় 'আল-উম্মাহ আঙ্কারায় তুলে ধরল তার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।

সংখ্যার অপরাংশে ইস্তাম্বুল সম্মেলনের মূল ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রেখে কোরআন শিক্ষার আলোকে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে এমন কিছু মৌলিক ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে সমস্যাগুলোকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আমরা সতর্ক নজর রাখছি। চলমান অস্থিরতার বহুমুখী মাত্রা, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও গভীর বিশ্লেষণভিত্তিক প্রতিবেদন নিয়ে আগামী সংখ্যায় হাজির হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

– প্রধান সম্পাদক

আল-উম্মাহ

মা সি ক জা র্না ল

উপদেষ্টা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
অধ্যাপক ড. এম কবির হাসান
অধ্যাপক ড. নাকিব নসরুল্লাহ

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ জাকির হোসাইন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাসুমুর রহমান খলিলী

সম্পাদনা সহযোগী
দ্বীন মোহাম্মাদ দুখু

ডিজাইন অ্যান্ড গ্রাফিক্স
এম. জামান

আল-উম্মাহ, একটি মাসিক জার্নাল, বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়। প্রিয় লেখকবৃন্দ, আপনারা সমসাময়িক বিষয়াবলী, ইসলামী বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা, ইতিহাস, এবং জননীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। আমরা ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় ১৩০০ শব্দের অনধিক মৌলিক ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানাই।
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:

info@al-ummah.org
www.al-ummah.org

مؤسسة الأمة
AL-UMMAH FOUNDATION

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনস (বিআইসিআরডি)
ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্য : ১০০ টাকা



ইস্তাম্বুল সম্মেলনে ইনসাফভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও গাজায় জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান পৃ. ৪

১২ বিভক্ত বিশ্বে আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ: সভ্যতার রাজনীতি ও শান্তির নতুন তত্ত্ব
১৭ বাংলাদেশি নারীদের জন্য তুরস্কের প্রথম কোরআন শিক্ষাবৃত্তি: জোরদার হচ্ছে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক
১৮ শিরচ্ছেদের ঘটনায় বিভ্রান্তি কাম্য নয়
২১ অধিকৃত জেরুজালেমে কলম্বিয়ার দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ওআইসির
২২ মুসলিমদের নবজাগরণের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা
২৫ শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের পুনরুত্থান : ঘৃণা ও বিভাজনের রাজনীতির নেপথ্যে বর্ণবাদ
২৯ ব্যাংক সংস্কারের কেন্দ্রে থাকুক আমানতকারীর অধিকার
৩৩ মধ্যপন্থী উম্মাহর ঐক্য : নীতির ভিত্তি থেকে কার্যকর সনদের পথে
৪১ ইসরাইলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আরব রাজনৈতিক সদিচ্ছার সংকট
৪৪ কেন উপদেশ কুরআনের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে

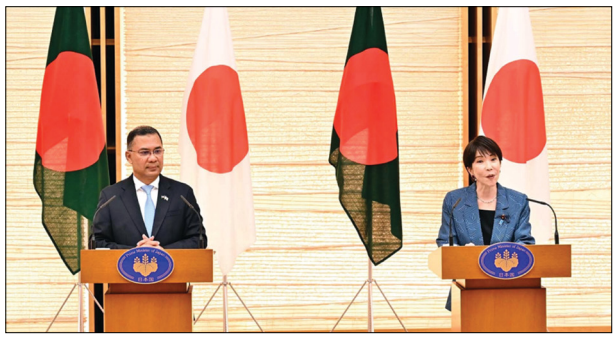

দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা পৃ. ৫৭



বৈশ্বিক লক্ষ্য নিয়ে আঙ্কারায় আল-উম্মাহ

পৃ. ৮

৫১ বাংলাদেশের ডেঙ্গু সংকট: মৃত্যুর মিছিলে জনআতঙ্ক ও প্রতিরোধে টিকাদান
৫৫ দামেস্কে সালাহউদ্দিনের মাজার সংস্কারে তুরস্কের সহায়তা
৬০ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার : রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের আলোকে একটি সংস্কার-প্রস্তাব
৬৫ তথ্যের যুগে স্মৃতির সঙ্কট
৬৮ সিঙ্গাপুরের মসজিদ বেনকুলেনের ২০০ বছর : ঈমান, ঐতিহ্য ও সেবার অনন্য ইতিহাস
৭১ বুরকিনা ফাসোয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করে বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা চালু

সাক্ষাৎকার - রোজিনা আলী

৪৬ একজন আমেরিকান মুসলিমের কি ব্যতিক্রমী অবস্থান রয়েছে?



ধর্মীয় প্রতীক অবমাননা : আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন

পৃ. ৩৮



প্রতিবেদক

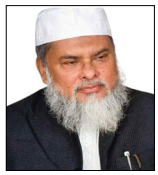
আ ফ ম খালিদ হোসেন, পিএইচডি


ডা. বশীর আহমেদ, M.D


ড. শাহজাহান খান OAM


মোহাম্মদ কবির হাসান, পিএইচডি


ড. মুহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী


মোহাম্মদ আবু আজুর


গওহর কাদির ওয়ানি


অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক


মাসুমুর রহমান খলিলী

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

লেখকদের প্রকাশিত মতামত তাদের নিজস্ব। প্রকাশক এর জন্য কোনো দায়ভার গ্রহণ করে না।

পাঠকেরা এই জার্নালের বিষয়বস্তু ব্যবহার, পুনর্মুদ্রণ বা পুনরায় প্রকাশ করতে পারবেন; তবে শর্ত থাকে যে এর জন্য আমাদের কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের একটি লিঙ্ক যুক্ত করতে হবে।



ইস্তাম্বুল সম্মেলনে ইনসাফভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও গাজায় জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

“মানবজাতির মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলোর সমাধানে ইসলাম কতটা প্রাসঙ্গিক, এই সিম্পোজিয়াম সে বিষয়ে একটি গঠনমূলক ও দূরদর্শী বার্তা দেয়।”

– মোহাম্মদ জাকির হোসাইন

শক্তির দাপট নয়, বরং ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম। একই সঙ্গে গাজায় অবিলম্বে ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত সংকট মোকাবিলায় ঈমানভিত্তিক সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

‘বৈশ্বিক সংকটে কুরআনিক সমাধান’ প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ৪-৬

অক্টোবর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ১৩তম আন্তর্জাতিক বদিউজ্জামান সিম্পোজিয়ামের সমাপনী অধিবেশনে এসব আহ্বান জানানো হয়।

ইস্তাম্বুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচার (İİKV) আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের ৬০টি দেশের ৪৪৮টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৩০ জনেরও বেশি আলেম ও গবেষক অংশ নেন। সম্মেলনে মোট ৬৬৮টি গবেষণাপত্র জমা পড়ে, যার মধ্য থেকে নির্বাচিত ২৬২টি গবেষণাপত্র তুর্কি, আরবি, ইংরেজি ও রুশ ভাষায় উপস্থাপিত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে এই সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সম্মেলনে কুরআন, সুন্নাহ এবং প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর শিক্ষা ও দর্শনের আলোকে সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে আসে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিসালে-ই নূর'।

সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেবদেত ইলমাজ, সিরিয়ার ওয়াকফমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আবুলখায়ের শুকরি, তুরস্কের ধর্মবিষয়ক প্রধান অধ্যাপক ড. সাফি আরপাগুশ, ইস্তাম্বুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচার (İİKV)-এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সাঈদ ইউসে এবং ব্রিটিশ সম্প্রচারক ও সাংবাদিক লরেন বুথ।

এ ছাড়া সৌদি আরবের বিশিষ্ট আলেম প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ আল-মুসলিহ, সিরিয়ার মুফতি ড. ওসামা এর-রিফাই, পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা মাওলানা ফজলুর রহমান এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসাইন সম্মেলনে অংশ নেন।

সম্মেলন সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসাইন বলেন, "বৈশ্বিক সংকট ও চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান খুঁজতে কুরআনের শরণাপন্ন হওয়াই ছিল এই সিম্পোজিয়ামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। এটি মানবজাতির বর্তমান সংকট মোকাবিলায় ইসলামের গঠনমূলক ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে।"

সম্মেলনে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানবজাতির মুখোমুখি হওয়া নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল–নতুন বিশ্বব্যবস্থায় সভ্যতার ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি; সংকট থেকে দায়িত্ববোধ: কুরআনভিত্তিক নৈতিক পুনর্জাগরণ এবং বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর চিন্তায় সভ্যতা বিনির্মাণ; কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আধুনিক সামাজিক সমস্যার সমাধান; রাজনীতির ঊর্ধ্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের প্রাধান্য এবং সমাজে ঈমানের রূপান্তরকারী প্রভাব।

বৈশ্বিক সংকটসমূহ

সিম্পোজিয়ামে যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি, অবিচার, পরিবেশবিধ্বংস, পারিবারিক কাঠামোর দুর্বলতা, জীবনের অর্থ খুঁজতে তরুণ প্রজন্মের আকুলতা এবং ডিজিটাল যুগে ঈমান ও নৈতিকতার সামনে তৈরি হওয়া নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

> কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল জীবন নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে এবং এর প্রয়োগ অবশ্যই নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত

সমাপনী ঘোষণাপত্র বলা হয়, বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সংকটগুলোর গভীরে রয়েছে একটি আধ্যাত্মিক সংকট। এর মূল কারণ হলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। নৈতিক দিকনির্দেশনার অভাবে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও ক্ষমতার অগ্রগতি মানবকল্যাণের পরিবর্তে ধ্বংসের কারণও হতে পারে।

সৃষ্টিজগৎ তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের নিদর্শন বহন করে–বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর এই দর্শনের আলোকে অংশগ্রহণকারীরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ন্যায়বিচার, দয়া, দায়িত্ববোধ ও মানবমর্যাদার ভিত্তিতে নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গাজা ও বৈশ্বিক ন্যায়বিচার

সম্মেলনের ঘোষণাপত্র গাজার বেসামরিক নাগরিক, হাসপাতাল, স্কুল ও উপাসনালয়ে ইসরায়েলি হামলা এবং ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর পথে বাধা সৃষ্টির তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এসব কর্মকাণ্ডকে ঘোষণাপত্র স্পষ্টভাবে 'গণহত্যা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহকে আরও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে অবিলম্বে হামলা বন্ধ,



স্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা, বাধাহীন মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় অপরাধীদের বিচার দাবি করা হয়। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনি জনগণের নিজেদের ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।

সামগ্রিকভাবে, সম্মেলনে এমন এক বৈশ্বিক ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়, যেখানে ক্ষমতার দাপটে মানুষের অধিকার পদদলিত হয়, দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করা হয় এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

ঘোষণাপত্র আরও বলা হয়, জাতি, ধর্ম কিংবা ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জীবন, বুদ্ধি, বংশমর্যাদা, সম্পদ ও বিশ্বাস রক্ষা করা রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মূল দায়িত্ব। অংশগ্রহণকারীরা স্বার্থপরতার পরিবর্তে মহৎ গুণাবলি, সংঘাতের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বর্ণগত বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ববোধকে প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে পরামর্শ, স্বাধীনতা, আইনের শাসন এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতাকে সুশাসনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংঘাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে পারস্পরিক সহযোগিতা, সংলাপ ও সেবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নূরসীর 'ইতিবাচক পদক্ষেপ' (পজিটিভ অ্যাকশন) নীতির প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

অংশগ্রহণকারীরা বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়ে বলেন, মতপার্থক্য যেন কোনোভাবেই পারস্পরিক শত্রুতায় রূপ না নেয়। একই সঙ্গে অভিন্ন মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে 'আহলে কিতাব'সহ অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতামূলক নীতি অনুসরণের তাগিদ দেওয়া হয়।

নৈতিক ও পরিবেশগত সংকট

সিম্পোজিয়ামে পরিবেশবিধ্বংসকে একটি গভীর নৈতিক সংকট হিসেবে তুলে ধরে বলা হয়, প্রকৃতিকে সীমাহীন ভোগের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করাই এই সংকটের অন্যতম কারণ। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ভোগ কমানো, অপচয় রোধ এবং খাদ্যের অপচয় বন্ধে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পাঠযোগ্য একটি 'বই' হিসেবে দেখার নূরসীয় দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে সৃষ্টিজগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত করে।

অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা অতিরিক্ত লোভ ও সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতাকে অস্থিরতার অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁরা দারিদ্র্য, মজুতদারি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার পাশাপাশি মিতব্যয়িতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা ও হালাল উপার্জনের নীতি অনুসরণের সুপারিশ করেন। একই সঙ্গে হালাল অর্থায়নব্যবস্থা এবং টেকসই ভোগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

পরিবারব্যবস্থা রক্ষা ও শিক্ষা

পরিবারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ছিল সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সুপারিশ। এ লক্ষ্যে পরিবার সুরক্ষায় কার্যকর আইন প্রণয়ন, শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালু, কাউন্সেলিং সেবা সম্প্রসারণ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রবীণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

শিক্ষা সম্পর্কে সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; নৈতিক চরিত্র গঠনেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর 'মাদ্রাসা আল-জাহরা' প্রকল্পের কথা স্মরণ করে অংশগ্রহণকারীরা প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। এ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এ ছাড়া নূরসীর 'এ গাইড ফর ইয়ুথ' বা 'তরুণদের জন্য দিকনির্দেশনা' গ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বাস, সততা ও নৈতিক সংযমের নীতি অনুসরণের মাধ্যমে তরুণদের নিজস্ব পরিচয় ও জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সহায়তা করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

অভিবাসন প্রসঙ্গে যুদ্ধ ও অন্যান্য সংকটে বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রতি মানবিক আচরণের আহ্বান জানানো হয়। এ ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের পবিত্রতা সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও ডিজিটাল জীবন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল জীবন নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে এবং এর প্রয়োগ অবশ্যই নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

তাঁরা ডিজিটাল আসক্তি, 'অ্যাটেনশন ইকোনমি' বা মানুষের মনোযোগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য ও নৈতিক বিকাশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করেন। পরিবার ও তরুণ প্রজন্মকে এসব ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত রাখতে আত্মসচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তির পরিমিত ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ঘোষণাপত্র বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক আঘাত মোকাবিলায় আধুনিক মনোচিকিৎসার সঙ্গে বিশ্বাস, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর ওপর ভরসার মতো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়।

বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে–এই অবস্থানে অটল থেকে বক্তারা বলেন, প্রাকৃতিক জগৎ মূলত সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত শৃঙ্খলা ও সৃষ্টিশৈলীর নিদর্শন বহন করে। সত্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ার এই সময়ে মানুষের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে যুক্তিনির্ভর গবেষণা, প্রমাণভিত্তিক আলোচনা,



আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসাইন (বাঁয়ে) ৪-৬ অক্টোবর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ১৩তম আন্তর্জাতিক বদিউজ্জামান সিম্পোজিয়ামের পার্শ্ববৈঠকে ইস্তাম্বুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচার (İİKV)-এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সাঈদ ইউসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সাহিত্যচর্চা ও শিল্পকলার চর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

সম্মেলনের আয়োজক কমিটি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো, তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা (TİKA), প্রেসিডেন্সি ফর টার্কস অ্যাব্রোড অ্যান্ড রিলেটেড কমিউনিটিজ, অংশীদার বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সহযোগী ও অবদানকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

সম্মেলনে যাতায়াত সহযোগিতা দিয়েছে টার্কিশ এয়ারলাইন্স। অন্যদিকে, টিআরটি (TRT) ও আনাদোলু এজেন্সি যোগাযোগ অংশীদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

আয়োজক কমিটি আশা প্রকাশ করে, সিম্পোজিয়ামে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলো বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে 'রিসালে-ই নূর'-এর বার্তা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ■



বৈশ্বিক লক্ষ্য নিয়ে আঙ্কারায় আল-উম্মাহ

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

আঙ্কারায় তুরস্কের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসাইনের বৈঠক। ঐতিহ্য সংরক্ষণ, গবেষণা এবং ফাউন্ডেশনের বহুভাষিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্মের পরিধি বাড়াতে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা।

সারসংক্ষেপ:

আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত এসব বৈঠক আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অধ্যাপক ড. সেলিম আরগুন ও অধ্যাপক ড. ইয়াসিন আকতাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা তুলে ধরা, মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো অনুসন্ধানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও আল-উম্মাহর প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসাইন তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা সফর করেছেন। এ সময় তিনি ফাউন্ডেশনের বৈশ্বিক বহুভাষিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে দেশটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রস্তাবিত এই প্ল্যাটফর্মে সাংবাদিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করা বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পাবে।

ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউটের সভাপতি অধ্যাপক ড. সেলিম আরগুন এবং তুরস্কের বিশিষ্ট পণ্ডিত, লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ড. ইয়াসিন আকতাইয়ের সঙ্গে এসব বৈঠকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মুসলিম সমাজের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম উদ্যোগের বিকাশ এবং বাংলাদেশ ও তুরস্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।

ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউট সফর

আঙ্কারায় ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে অধ্যাপক ড. সেলিম আরগুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসাইন। বৈঠকে ইসলামী ও মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ঐতিহাসিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউট ও আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।

জনাব জাকির হোসাইন অধ্যাপক আরগুনকে ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট ও সাময়িকী সম্পর্কে অবহিত করেন। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করা বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকতা, জ্ঞান বিনিময় এবং তথ্যনির্ভর আলোচনার প্রসারে ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

অধ্যাপক আরগুন এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এর সম্ভাব্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। বৈঠকে উভয় পক্ষই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন।

এ সময় মোহাম্মদ জাকির হোসাইন অধ্যাপক আরগুনকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার সেতুবন্ধন

ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউট তুরস্কের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেশটির সাংস্কৃতিক কূটনীতিতেও প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আনাতোলিয়ার খ্যাতিমান কবি ইউনুস এমরের নামে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বিশ্বজুড়ে তুর্কি ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও শিল্পকলার প্রচারে কাজ করে।

২০০৭ সালের ৫ মে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউট আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে তুর্কি ভাষা ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করে তোলাই এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে তুর্কি ভাষা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক অনুষ্ঠান আয়োজন, বিদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তুর্কি ভাষা শিক্ষার প্রসারে সহায়তা এবং শিক্ষাগত আদান-প্রদান ও আন্তসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধির উদ্যোগ।

ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউট যেখানে তুর্কি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচারে গুরুত্ব দেয়, সেখানে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য হলো এমন একটি বহুভাষিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান ও সমসাময়িক বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে।

দুই প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্রগুলো পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে। তবে ভবিষ্যতে কোনো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে আলোচনা, পরিকল্পনা ও পারস্পরিক সমঝোতার প্রয়োজন হবে।

অধ্যাপক ইয়াসিন আকতাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ

আঙ্কারা সফরে বিশিষ্ট তুর্কি শিক্ষাবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ড. ইয়াসিন আকতাইয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন মোহাম্মদ জাকির হোসাইন। গবেষণা, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও জনপরিসরের আলোচনায় অধ্যাপক আকতাইয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

অধ্যাপক আকতাই তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগানের প্রধান উপদেষ্টা এবং দেশটির জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (একে পার্টি) ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তুরস্কসহ বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে তিনি জনপরিসরের আলোচনায় অবদান রেখে চলেছেন।

বৈঠকে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশ ও তুরস্কের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ নিয়ে মতবিনিময় হয়।



আলোচনায় মুসলিম বিশ্বের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ জোরদারের গুরুত্ব বিশেষভাবে উঠে আসে। অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করেন, কীভাবে তথ্যনির্ভর বিতর্ক, বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা ও গঠনমূলক সংলাপ পারস্পরিক চ্যালেঞ্জগুলো গভীরভাবে বুঝতে সহায়তা করতে পারে।

মোহাম্মদ জাকির হোসাইন অধ্যাপক আকতাইকে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট ও সাময়িকীর অগ্রগতি সম্পর্কে জানান। একই সঙ্গে জাতীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম সম্প্রদায়কে যুক্ত করতে একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

এর আগে বাংলাদেশ সফরের সময় অধ্যাপক আকতাই আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট ও সাময়িকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। সে সময় তিনি প্রকল্পটির গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য দেন। ফলে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই অবগত ছিলেন।

বাংলাদেশ সফরের পর আঙ্কারায় এই সাক্ষাতে অধ্যাপক আকতাই প্ল্যাটফর্মটির অগ্রগতি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ দেন। আলোচনায় একটি নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ, পেশাদার সাংবাদিকতা ও আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়।

ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা যায়, বৈঠকে ধারাবাহিক যোগাযোগ বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতার সম্ভাবনা অনুসন্ধানের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে পারস্পরিক সম্মতি ও উপযুক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে ডিসেম্বরের শুরুতে ইস্তাম্বুলে আরেকটি বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাব রয়েছে।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারের সম্ভাবনা

আঙ্কারার এসব বৈঠক বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার সম্ভাবনা তুলে ধরেছে। উভয় দেশেই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে

এবং দেশ দুটির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাও স্বতন্ত্র।

শিক্ষা ও গবেষণায় আদান-প্রদান, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, প্রকাশনা এবং পেশাদার গণমাধ্যম উদ্যোগের মাধ্যমে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে একে অপরের ইতিহাস, সমাজ ও সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ধারণা তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য তুরস্কের পণ্ডিত ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষাবিষয়ক নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করা এবং তরুণ প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক আলোচনায় সম্পৃক্ত করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

অন্যদিকে, তুরস্কের প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সংলাপ দেশটির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিক্ষাঙ্গন, জনপরিসরের আলোচনা এবং ক্রমবিকাশমান গণমাধ্যম পরিবেশ সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

জ্ঞান ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা

আঙ্কারার আলোচনায় উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি ছিল তরুণ প্রজন্মকে তাদের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করার গুরুত্ব।

বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরুণদের জন্য নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র, শিক্ষার সুযোগ এবং তথ্যনির্ভর আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা জরুরি। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের সমাজকে গড়ে তোলা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। পাশাপাশি সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেতন ভূমিকা পালনের সুযোগ পাবে।

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন তার ওয়েবসাইট ও সাময়িকীর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে অবদান রাখতে চায়। একই সঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও অনুসন্ধান করছে।

ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেদন, গবেষকদের লেখা, শিক্ষামূলক প্রকাশনা এবং বাংলাদেশ ও তুরস্কের গবেষকদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময়ের মতো উদ্যোগ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এসব এখনো সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র; সুনির্দিষ্ট যৌথ কর্মসূচি হিসেবে চূড়ান্ত হয়নি।

তরুণ পাঠক ও দর্শকদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ফাউন্ডেশন তার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কার্যক্রমকে শিক্ষামূলক লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। এর উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশ ও ভাষার মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক জ্ঞান এবং তথ্যনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি আরও সহজলভ্য করে তোলা।

তরুণ পাঠক ও দর্শকদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ফাউন্ডেশন তার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কার্যক্রমকে শিক্ষামূলক লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। এর উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশ ও ভাষার মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক জ্ঞান এবং তথ্যনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি আরও সহজলভ্য করে তোলা।

বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা

আঙ্কারার বৈঠকগুলো আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অধ্যাপক ড. সেলিম আরগুন ও অধ্যাপক ড. ইয়াসিন আকতাইয়ের সঙ্গে এসব বৈঠকে ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য তুলে ধরা, মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করা বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র অনুসন্ধানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য হলো এসব আলোচনাকে ধারাবাহিক যোগাযোগ, পারস্পরিক সম্মত কর্মসূচি এবং উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক অংশীদারত্বের মাধ্যমে বাস্তব উদ্যোগে রূপ দেওয়া।

প্রস্তাবিত ইস্তাম্বুল বৈঠক এবং ইউনুস এমরে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ভবিষ্যৎ যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য আরও পরিকল্পনা ও পারস্পরিক সমঝোতা প্রয়োজন হবে।

ফাউন্ডেশনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য সাংবাদিকতা, অর্থবহ বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদান এবং পেশাদার ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত বহুভাষিক প্রকাশনা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। এসব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম উদ্যোগ আরও সুসংহত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। ■



বিভক্ত বিশ্বে আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ: সভ্যতার রাজনীতি ও শান্তির নতুন তত্ত্ব

বিভক্ত বিশ্বে আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ: সভ্যতার রাজনীতি ও শান্তির নতুন তত্ত্ব

আল-উম্মাহ বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ : *সমসাময়িক বিশ্বে পরিচয়কেন্দ্রিক সংঘাত, রাজনৈতিক মেরুকরণ, বৈষম্য ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বৈধতার সংকট মোকাবিলায় আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালের ২৭ অক্টোবর বাকুতে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ফোরামের প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধটি স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাত, ইয়ুর্গেন হাবারমাসের যোগাযোগমূলক যুক্তিবাদ, অ্যাক্সেল হনেথের স্বীকৃতির তত্ত্ব এবং জোহান গালতুংয়ের শান্তি বিশ্লেষণের আলোকে সংলাপের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করেছে। এর মূল যুক্তি হলো–ন্যায়বিচার, সমমর্যাদা, জবাবদিহি ও ক্ষমতার বৈষম্য নিরসন ছাড়া কেবল সংলাপের মাধ্যমে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।*

১. ভূমিকা : সংলাপের প্রয়োজন কেন বাড়ছে?

বিশ্বায়ন ভৌগোলিক দূরত্ব কমিয়েছে, অর্থনীতি ও প্রযুক্তিকে পরস্পরনির্ভরশীল করেছে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের যোগাযোগের সুযোগ প্রসারিত করেছে। অথচ একই সঙ্গে ধর্মীয় বিদ্বেষ, জাতিগত মেরুকরণ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং ভূরাজনৈতিক সংঘাত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আরও বিভক্ত করে তুলছে। এই আপাতবিরোধ সমসাময়িক বিশ্বের একটি **মৌলিক বৈশিষ্ট্য:** যোগাযোগের পরিমাণ বাড়লেও পারস্পরিক বোঝাপড়া অনিবার্যভাবে বাড়ছে না।

২০২৬ সালের ২৭ অক্টোবর আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে সপ্তম বিশ্ব আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) মহাসচিব ইসমাইল উলদ শেখ আহমেদের অংশগ্রহণ এই বাস্তবতায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'Dialogue for a Shared Future: Building Bridges in a Fractured World'

প্রতিপাদ্যে আয়োজিত ফোরামে তিনি গঠনমূলক সংলাপকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং স্থিতিশীলতা রক্ষার জরুরি প্রয়োজন হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মানবসমাজের শক্তি হিসেবে ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন এবং ঘৃণা ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আহ্বান জানান।

তবে এই বক্তব্যের তাৎপর্য শুধু কূটনৈতিক পর্যায়ে সংলাপের পক্ষে সমর্থন প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি বৃহত্তর তাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করে: গভীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজনের মধ্যে সংলাপ কি সত্যিই শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদ্ধতি, নাকি ক্ষমতার অসমতা অক্ষুণ্ন রেখে বিরোধকে সাময়িকভাবে আড়াল করার একটি কূটনৈতিক কৌশল?

এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় যুক্তি হলো–আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের কার্যকারিতা মূলত তিনটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত শর্তের ওপর নির্ভর করে: পরস্পরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের স্বীকৃতি, ন্যায়সংগত যোগাযোগের সুযোগ এবং সংলাপের ফলাফলকে বাস্তব প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে রূপান্তর করার রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

২. তাত্ত্বিক কাঠামো: সভ্যতার সংঘাত থেকে সংলাপের রাজনীতি

২.১ সভ্যতার সংঘাত: পরিচয়ের অপরিহার্যতা, নাকি রাজনৈতিক নির্মাণ?

স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর ১৯৯৩ সালের প্রবন্ধ 'The Clash of Civilizations?' এবং ১৯৯৬ সালের গ্রন্থ The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order-এ যুক্তি দেন যে, শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে সংঘাতের প্রধান বিভাজনরেখা আদর্শিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে। তাঁর বিশ্লেষণে ধর্ম, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্মিলিত পরিচয় নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এই তত্ত্বের শক্তি হলো, এটি দেখায় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সব সময় বস্তুগত স্বার্থ দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের সম্মিলিত স্মৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় রাষ্ট্রের আচরণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

কিন্তু তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতাকে স্থির, সমজাতীয় এবং পরস্পরবিরোধী একক হিসেবে দেখলে একই সভ্যতার অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ঐতিহাসিক আদান-প্রদানের গুরুত্ব উপেক্ষিত হয়। মুসলিম সমাজ, ইউরোপীয় সমাজ কিংবা এশীয় সমাজ–কোনোটিই একক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সত্তা নয়। প্রতিটি পরিসরেই বিভিন্ন মতাদর্শ, স্বার্থ ও পরিচয়ের সহাবস্থান রয়েছে।

তদুপরি, সভ্যতাগত পরিচয় নিজে থেকেই সংঘাত সৃষ্টি করে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নিরাপত্তাসংক্রান্ত উদ্বেগ, সম্পদের প্রতিযোগিতা এবং ঐতিহাসিক ক্ষোভের নির্বাচিত ব্যবহার পরিচয়কে সংঘাতের হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে।

এখানেই আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের গুরুত্ব নিহিত। এর লক্ষ্য সভ্যতার পার্থক্য বিলুপ্ত করা নয়; বরং পার্থক্যকে শত্রুতার অনিবার্য কারণ হিসেবে উপস্থাপনের রাজনৈতিক প্রবণতাকে চ্যালেঞ্জ করা। বাকু ফোরামের প্রতিপাদ্যকে এই অর্থে সভ্যতার সংঘাতের অনিবার্যতার বিরুদ্ধে একটি বিকল্প নীতিগত অবস্থান হিসেবে দেখা যায়। তবে এটি হান্টিংটনের তত্ত্বের সরাসরি খণ্ডন নয়; বরং সাংস্কৃতিক পার্থক্য কীভাবে রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হবে, সেই প্রশ্নে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি।

২.২ হাবারমাসের যোগাযোগমূলক যুক্তিবাদ: সংলাপ কতটা ন্যায়সংগত?

জার্মান দার্শনিক ইয়ুর্গেন হাবারমাসের যোগাযোগমূলক ক্রিয়াতত্ত্ব (Theory of Communicative Action) সংলাপের কার্যকারিতা বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। তাঁর মতে, মানুষের যোগাযোগ শুধু নিজের স্বার্থ অর্জনের উপায় নয়; যুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরিরও একটি প্রক্রিয়া।

কিন্তু সব যোগাযোগ সমান নয়। কোনো আলোচনায় যদি এক পক্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক প্রভাব, গণমাধ্যমে প্রবেশাধিকার কিংবা বক্তব্য নির্ধারণের সক্ষমতা অন্য পক্ষের তুলনায় অনেক বেশি হয়, তাহলে আনুষ্ঠানিকভাবে সমান অংশগ্রহণ থাকলেও প্রকৃত অর্থে সমান সংলাপ প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে।

এই তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কোনো ফোরামে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেই সেখানে সমমর্যাদার যোগাযোগ নিশ্চিত হয় না। কোন সংকট আলোচ্য হবে, কোন ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা হবে, কোন পক্ষের অভিজ্ঞতা প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আলোচনার ফলাফল কে নির্ধারণ করবে–এসব প্রশ্ন ক্ষমতার সম্পর্কের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

সুতরাং, বাকু ফোরামের মূল্যায়নে শুধু অংশগ্রহণকারীদের বৈচিত্র্য বিবেচনা করলেই চলবে না, বরং আলোচনার কাঠামোটিও গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সংঘাতকবলিত সমাজের প্রতিনিধি এবং তরুণদের অভিজ্ঞতা যদি নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ না পায়, তবে সংলাপের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র সীমিত থেকে যাবে।

হাবারমাসের কাঠামো অনুসারে, কার্যকর সংলাপের জন্য প্রয়োজন যুক্তিনির্ভর বিতর্ক, বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রশ্ন তোলার অধিকার এবং কর্তৃত্বকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে না রাখার পরিবেশ। এর অর্থ এই নয় যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে ক্ষমতা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব; বরং আলোচনায় ক্ষমতার প্রভাবকে দৃশ্যমান ও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

২.৩ স্বীকৃতির রাজনীতি: পারস্পরিক মর্যাদা ছাড়া শান্তি অসম্পূর্ণ

কানাডীয় দার্শনিক চার্লস টেলর এবং জার্মান দার্শনিক অ্যাক্সেল

হনেথের কাজ পরিচয় ও স্বীকৃতির সম্পর্ক ব্যাখ্যায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। টেলর দেখিয়েছেন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পরিচয় সামাজিক স্বীকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। হনেথ তাঁর The Struggle for Recognition গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন যে, স্বীকৃতির অভাব ও অসম্মান সামাজিক সংঘাতের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তঃসাংস্কৃতিক বিরোধ কেবল তথ্যের অভাব বা পারস্পরিক অজ্ঞতার সমস্যা নয়। কোনো জনগোষ্ঠী যখন মনে করে তার ধর্ম, ইতিহাস, ভাষা, স্মৃতি বা মানবিক মর্যাদাকে নিয়মিতভাবে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে, তখন সেই বিরোধ পরিচয় ও অস্তিত্বের সংকটে রূপ নেয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য স্পষ্ট করা দরকার: কোনো গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়কে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার প্রতিটি রাজনৈতিক দাবি অন্ধভাবে মেনে নেওয়া এক বিষয় নয়। গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদে পরিচয়ের মর্যাদা স্বীকারের পাশাপাশি ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সমান নাগরিকত্ব এবং সর্বজনীন মানবাধিকারের নীতিও সমানভাবে বজায় রাখতে হয়।

ওআইসির জন্য এই প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ধারণা, ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোর অভ্যন্তরে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করার প্রশ্নটিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তাই স্বীকৃতির নীতিকে হতে হবে পারস্পরিক। একটি গোষ্ঠী নিজের পরিচয়ের স্বীকৃতি দাবি করবে, অথচ অন্য গোষ্ঠীর সমান মর্যাদার প্রশ্ন উপেক্ষা করবে–এমন অবস্থান দীর্ঘমেয়াদি আস্থা তৈরি করতে পারে না।

২.৪ জোহান গালতুং: নেতিবাচক শান্তি থেকে ইতিবাচক শান্তি

শান্তি গবেষক জোহান গালতুং শান্তিকে কেবল প্রত্যক্ষ সহিংসতার অনুপস্থিতি হিসেবে দেখেননি। তাঁর বিশ্লেষণে নেতিবাচক শান্তি (Negative Peace) বলতে প্রত্যক্ষ সহিংসতা বা যুদ্ধের অনুপস্থিতিকে বোঝায়; অন্যদিকে ইতিবাচক শান্তি (Positive Peace) আরও বিস্তৃত এবং এর সঙ্গে কাঠামোগত সহিংসতা ও অন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রশ্ন যুক্ত থাকে।

এই পার্থক্য আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের বাস্তব মূল্যায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বন্ধ হতে পারে, অথচ বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা, অসম অধিকার এবং সামাজিক অবিশ্বাস আগের মতো অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা হলেও তার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল থেকে যায়।

একইভাবে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অঙ্গীকার করা তুলনামূলকভাবে সহজ; কিন্তু সংঘাতের পেছনে লুকিয়ে থাকা রাজনৈতিক বঞ্চনা, বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা এবং বিচারহীনতা দূর করা অনেক বেশি কঠিন।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে বাকু ফোরামের সাফল্য মূল্যায়নের জন্য একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসা উচিত: সংলাপ কি শুধু বিরোধের ভাষা নরম করছে, নাকি বিরোধের উৎপত্তিতে ভূমিকা রাখা সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শর্তগুলো পরিবর্তনের পথও প্রশস্ত করছে?

যদি ফোরামের আলোচনা শিক্ষা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সংখ্যালঘু অধিকার, সংঘাত-পরবর্তী পুনর্মিলন এবং বৈষম্যবিরোধী নীতিতে বাস্তব অগ্রগতি ঘটাতে পারে, তবে তা ইতিবাচক শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত অবদান রাখতে পারবে। অন্যথায় সংলাপের প্রভাব কেবল প্রতীকী পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকার আশঙ্কা থেকে যায়।

৩. বাকু ফোরাম: বহুপক্ষীয় কূটনীতি ও বৈশ্বিক শাসনের সংকট

বাকুতে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ফোরাম আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এতে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান, মন্ত্রী, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। টেকসই উন্নয়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, তরুণদের ভূমিকা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রসারের বিষয়গুলো এই ফোরামে গুরুত্ব পেয়েছে।

তবে এই উদ্যোগকে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার বৃহত্তর সংকটের সঙ্গে যুক্ত করেই দেখা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সহযোগিতা নিশ্চিত করতে পারলেও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর নীতি পরিবর্তন, দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের স্থায়ী সমাধান কিংবা মানবাধিকারের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সীমাবদ্ধতার মুখে পড়ে।

আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের ক্ষেত্রটিতেও একই সমস্যা বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক ফোরাম নীতিগত ঐকমত্য গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু সেই ঐকমত্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং অগ্রগতির নিয়মিত পরিমাপ ব্যবস্থা।

এখানে আজারবাইজানের ভূমিকা প্রশংসনীয় হলেও এই সম্মেলন আয়োজনকে তার কূটনৈতিক সাফল্যের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। বরং এই ধরনের আয়োজন কতটা দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা তৈরি করতে পারছে, বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আস্থা বাড়াচ্ছে এবং বাস্তব নীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করাটাই অধিক যুক্তিসংগত।

একই সঙ্গে সংলাপের নামে রাজনৈতিক বিরোধকে অস্বীকার করাও অনুচিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার অর্থ মতপার্থক্য চিরতরে মুছে ফেলা নয়; বরং এমন কার্যকর নিয়ম ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে বিরোধগুলো সহিংসতায় রূপ না নিয়ে ন্যায়সংগত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করা যায়।

৪. ওআইসির কৌশলগত সম্ভাবনা: পরিচয় রক্ষা, বহুত্ববাদ ও নীতিগত সামঞ্জস্য

ওআইসি হলো মুসলিম বিশ্বের বহুপক্ষীয় সহযোগিতার একটি অন্যতম প্রধান মঞ্চ। আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের ক্ষেত্রে এর সম্ভাব্য অবদান তিনটি স্তরে বিবেচনা করা যেতে পারে:

- প্রথমত, আন্তর্জাতিক পরিসরে মুসলিম সমাজ সম্পর্কে একমাত্রিক ও বৈষম্যমূলক বয়ানের বিরুদ্ধে তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর অবস্থান গড়ে তোলা।
- দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা, যুব বিনিময় এবং নাগরিক পর্যায়ের সহযোগিতা প্রসারিত করা।
- তৃতীয়ত, সংলাপের নীতিকে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমান মর্যাদার প্রশ্নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করা।

তবে এখানে ওআইসির সামনে একটি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সদস্যরাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আঞ্চলিক স্বার্থ এবং সামাজিক বাস্তবতায় ভিন্নতা রয়েছে। ফলে সংস্থার পক্ষে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিন্ন অবস্থান তৈরি করা বেশ কঠিন। তা সত্ত্বেও শিক্ষা, ধর্মীয় বিদ্বেষ মোকাবিলা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং তরুণদের সহযোগিতার মতো ক্ষেত্রগুলোতে বাস্তবসম্মত যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব।

ইসলামি নৈতিক ঐতিহ্যে মানবমর্যাদা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক পরিচয়ের যে গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে, তা এই প্রচেষ্টার মূল্যবোধগত শক্ত ভিত্তি হতে পারে। পবিত্র কুরআনের সুরা আল-হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে মানবজাতির বিন্যাসকে মূলত পরস্পরকে জানার সঙ্গেই যুক্ত করা হয়েছে। এই ধারণা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত করার পরিবর্তে পারস্পরিক পরিচিতি ও মর্যাদার ভিত্তিতে তা গ্রহণের একটি উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

তবে কেবল নৈতিক ঐতিহ্যের উল্লেখই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য নীতির ধারাবাহিক প্রয়োগ জরুরি। ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নেওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নেও একই নীতি ও সততার প্রতিফলন থাকা বাধ্যতামূলক।

৫. প্রযুক্তি, তরুণ প্রজন্ম ও সংলাপের নতুন রাজনৈতিক অর্থনীতি

ডিজিটাল প্রযুক্তি আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের সুযোগ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তথ্যের সহজলভ্যতা মানেই নির্ভরযোগ্য জ্ঞান বা পারস্পরিক বোঝাপড়ার নিশ্চয়তা নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং পরিচয়কেন্দ্রিক মেরুকরণ অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই পরিস্থিতিতে সংলাপকে কেবল মুখোমুখি আলোচনার বৃত্তে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ডিজিটাল পরিবেশে মানুষ কীভাবে অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য পায়, কোন বক্তব্য বেশি দৃশ্যমান হয় এবং কীভাবে ভুয়া তথ্য সমাজে অবিশ্বাস তৈরি করে—এসব প্রশ্নও আন্তঃসাংস্কৃতিক নীতির অপরিহার্য অংশ হওয়া উচিত।

এ ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের কেবল সম্মেলনের শ্রোতা হিসেবে না ভেবে গবেষক, নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণকারী, প্রযুক্তি-উদ্ভাবক এবং সামাজিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ডিজিটাল সাক্ষরতা, তথ্য যাচাই, ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ে বহুমাত্রিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন দেশের তরুণদের যৌথ প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। তবে ঘৃণাবিরোধী উদ্যোগ বাস্তবায়নের সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং যথাযথ বিচারিক পর্যালোচনা নিশ্চিত করাও জরুরি। অন্যথায় সংলাপের নামে যেকোনো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা জনমনে আরও বেশি অবিশ্বাস তৈরি করতে পারে।

৬. একটি সমন্বিত বিশ্লেষণী মডেল: সংলাপ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন

উপরিউক্ত তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের কার্যকারিতা মূল্যায়নে একটি সমন্বিত কাঠামো প্রস্তাব করা যায়, যা পাঁচটি পরস্পরসম্পর্কিত মাত্রার ওপর প্রতিষ্ঠিত:

১. স্বীকৃতি: বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিচয়, ইতিহাস, ভাষা ও মর্যাদাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কি না।

২. ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ: অংশগ্রহণকারীরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, প্রশ্ন উত্থাপন ও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার সুযোগ পাচ্ছেন কি না।

৩. কাঠামোগত ন্যায়বিচার: সংলাপের সঙ্গে বৈষম্য, বঞ্চনা, বিচারহীনতা এবং অসম সুযোগ মোকাবিলার সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ যুক্ত হচ্ছে কি না।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর: সম্মেলনের ঘোষণা ও সুপারিশগুলো বাস্তব নীতি, অর্থায়ন, যৌথ কর্মসূচি এবং জবাবদিহির ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে কি না।

৫. পরিমাপযোগ্য ফলাফল: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আস্থা, বৈষম্যবিরোধী নীতি, তরুণদের অংশগ্রহণ এবং সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি ঘটছে কি না।

এই পাঁচটি মাত্রা একটি কার্যকারণভিত্তিক বিশ্লেষণী মডেল তৈরি করে: স্বীকৃতি ও ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ সংলাপের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে পারে; বিশ্বাসযোগ্য সংলাপ সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে; আর সেই সহযোগিতা যখন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন ইতিবাচক শান্তির সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

তবে এই সম্পর্ক স্বয়ংক্রিয় নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, ক্ষমতার প্রবল অসমতা এবং বাস্তবায়ন কাঠামোর দুর্বলতা যেকোনো পর্যায়ে এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত



করতে পারে। তাই এই মডেলকে প্রমাণিত ফলাফলের চূড়ান্ত দাবি হিসেবে নয়, বরং আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়নের একটি পরীক্ষাযোগ্য কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

৭. বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় দিক

বাংলাদেশের বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিশাল প্রবাসী জনগোষ্ঠী, চলমান রোহিঙ্গা সংকট এবং অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বাস্তবতায় আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আন্তধর্মীয় আলোচনা এবং তরুণদের যৌথ গবেষণার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে সহনশীলতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য এবং অভ্যন্তরীণ সমাজে সমান অধিকার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা একে অপরের পরিপূরক। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইনের সমান প্রয়োগ, বৈষম্য কঠোরভাবে মোকাবিলা করা এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের পরিবেশ শক্তিশালী করা ছাড়া আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের নৈতিক ভিত্তি কখনোই পূর্ণতা পায় না।

বাংলাদেশের জন্য তাই শিক্ষা কেবল আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং সংলাপকে নাগরিক শিক্ষা, দায়িত্বশীল নীতিনির্ধারণ, গণমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠতা এবং ন্যায়বিচারভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত করাই অধিক বাঞ্ছনীয়।

৮. উপসংহার: সংলাপের নৈতিকতা থেকে শান্তির প্রতিষ্ঠান

বাকুর সপ্তম বিশ্ব আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ফোরাম এমন এক বৈশ্বিক বাস্তবতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক মেরুকরণের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ওআইসি মহাসচিবের বক্তব্য সংলাপকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জরুরি প্রয়োজন হিসেবে সামনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই বক্তব্যের প্রকৃত সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করবে সংলাপের ধারণাটি কতটা কার্যকর রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় তার ওপর।

হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে; হাবারমাসের যোগাযোগমূলক যুক্তিবাদ ন্যায়সংগত সংলাপের পূর্বশর্ত অনুসন্ধান করে; হনেথের স্বীকৃতির তত্ত্ব মানুষের মর্যাদা ও পরিচয়ের প্রশ্নটিকে সামনে আনে; আর গালতুংয়ের শান্তি বিশ্লেষণ আমাদের দেখায় যে, প্রত্যক্ষ সহিংসতা বন্ধ হওয়া এবং ন্যায়ভিত্তিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো একত্রে আমাদের এই বার্তাই দেয় যে, আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের সফলতা কেবল সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না; এটি ক্ষমতার সম্পর্ক, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

সুতরাং, বিভক্ত বিশ্বে টেকসই শান্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সংস্কৃতিগুলোর মধ্যকার পার্থক্য জোর করে মুছে ফেলা নয়; বরং সেই পার্থক্যের মধ্যেও সমান মর্যাদা, ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বাকুর ফোরাম যদি কেবল আন্তর্জাতিক ঘোষণার চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, বৈষম্যবিরোধী নীতি এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে কার্যকর অবদান রাখতে পারে, তবেই তা প্রতীকী কূটনীতির গণ্ডি পেরিয়ে সার্থকতা লাভ করবে। অন্যথায়, সংলাপের ভাষা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, বাস্তব বিশ্বে বিভাজনের কাঠামো অক্ষুণ্ন থেকেই যাবে।

পরিশেষে, সংলাপের প্রকৃত পরীক্ষা সম্মেলনকক্ষের বর্ণাঢ্য মঞ্চে নয়; বরং সেই মঞ্চের বাইরে–রাষ্ট্রের নীতিতে, প্রতিষ্ঠানের আচরণে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অপরের মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়ার বাস্তব সক্ষমতার মধ্যেই নিহিত। ■



তুরস্কের প্রেসিডেন্সির অধীন আজিজ মাহমুদ হুদায়ি ফাউন্ডেশন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি নারীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে।

বাংলাদেশি নারীদের জন্য তুরস্কের প্রথম কোরআন শিক্ষাবৃত্তি: জোরদার হচ্ছে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

সারসংক্ষেপ: *এই উদ্যোগ শিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।*

তুরস্কের আজিজ মাহমুদ হুদায়ি ফাউন্ডেশনের পূর্ণ বৃত্তির আওতায় দুই বছর মেয়াদি কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে বাংলাদেশের সাত নারী শিক্ষার্থীর একটি দল চলতি বছরের ৫ অক্টোবর ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছে।

এর আগে, তুরস্কের প্রেসিডেন্সির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট আজিজ মাহমুদ হুদায়ি ফাউন্ডেশন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি নারীদের জন্য এই পূর্ণাঙ্গ বৃত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে।

কার্যক্রমটির বিস্তারিত জানিয়ে ইস্তাম্বুলে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল জানিয়েছে, এই বৃত্তির আওতায় সাত শিক্ষার্থীর যাতায়াতের বিমানভাড়া, আবাসন, খাবার, চিকিৎসাসেবা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রীর সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করছে ফাউন্ডেশন।

ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীরা পবিত্র কোরআনের পাশাপাশি হাদিস, ফিকহ ও ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি তাঁদের তুর্কি ভাষা শিক্ষাসহ বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং তরুণীদের জন্য প্রয়োজনীয় শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগও থাকবে তাঁদের।

শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা তুরস্কের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য দেশটির বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থান পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এ বৃত্তি কর্মসূচি চালুর করায় ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেল আজিজ মাহমুদ হুদায়ি ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশ করেছে। কনস্যুলেট মনে করে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র আরও সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি পারস্পরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশি কূটনৈতিক মিশনের ভাষ্য অনুযায়ী, "এই উদ্যোগ শিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও পারস্পরিক যোগাযোগকে আরও দৃঢ় করবে।" কর্মসূচিটি দুই দেশের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে মিশনটি।

এর আগে, ইস্তাম্বুলে পৌঁছানোর পর বাংলাদেশি কনসাল জেনারেলের সহধর্মিণী মারুফা বিনতে ইবরাহিমি সফররত শিক্ষার্থীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ■

– আল-উম্মাহ ডেস্ক

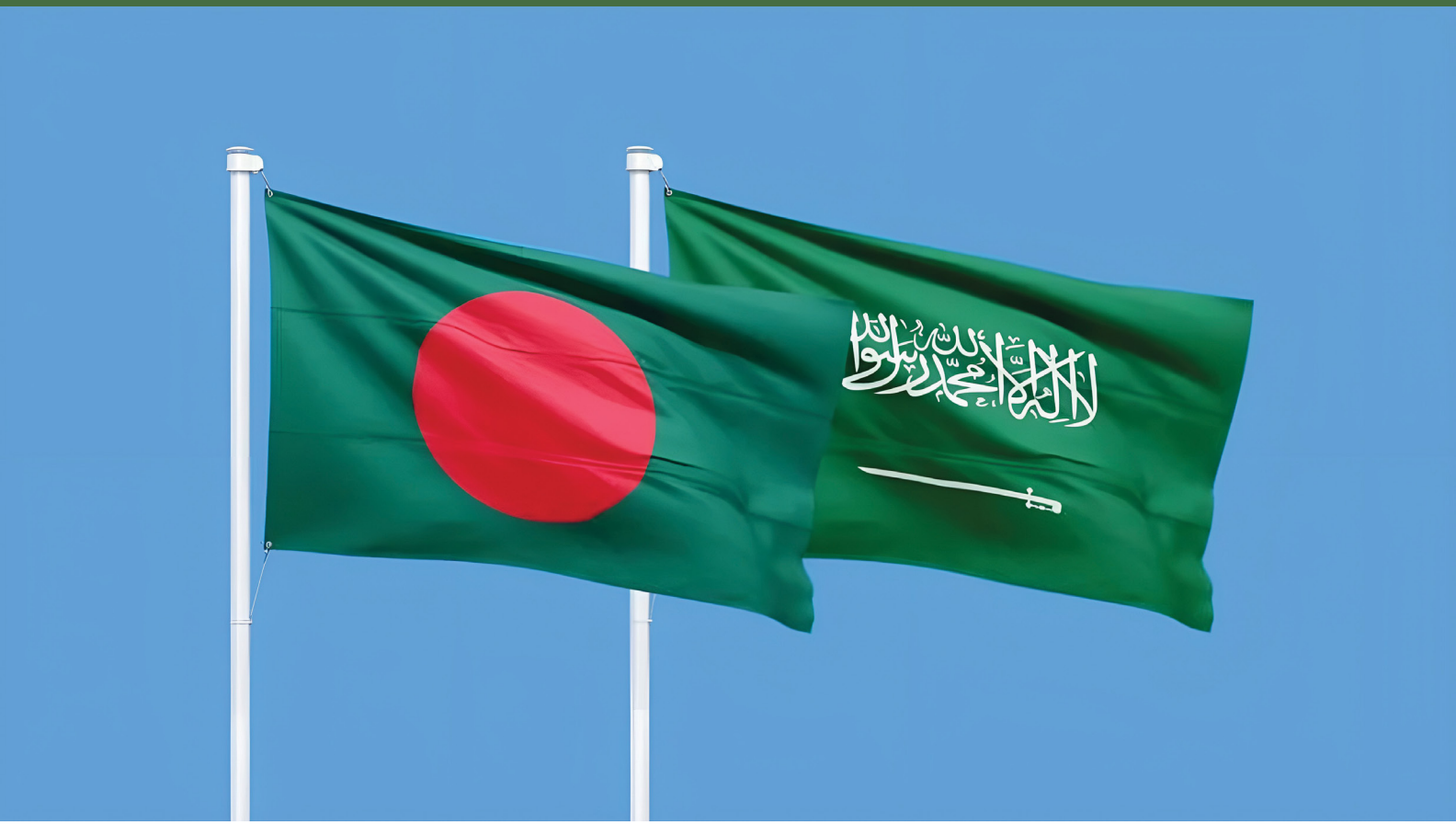

শিরচ্ছেদের ঘটনায় বিভ্রান্তি কাম্য নয়



ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
সাবেক উপদেষ্টা, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়,
অন্তর্বর্তী সরকার

সার সংক্ষেপ :

সৌদি আরবে দুই বাংলাদেশী নাগরিকের শিরচ্ছেদের ঘটনায় পররাষ্ট্রনীতি, কূটনৈতিক নজরদারি এবং প্রবাসী সুরক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা স্পষ্ট হয়েছে। বন্দীদের তালিকা হাতে থাকা সত্ত্বেও কনস্যুলেটের অবহেলা এবং যথাসময়ে তথ্য না দেওয়ায় তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। তা'জিরের আওতায় এ ধরনের মৃত্যুদণ্ডের যৌক্তিকতা ও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রবাসীদের আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণ, লেবার উইংয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং স্থায়ী আইনি সুরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই কেবল এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব।

সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে দুই বাংলাদেশী নাগরিকের শিরচ্ছেদের ঘটনা দেশের পররাষ্ট্রনীতি, কূটনৈতিক নজরদারি এবং প্রবাসী সুরক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিয়ে গভীর চিন্তার তাগিদ দেয়। বিদেশের মাটিতে কোনো নাগরিক আইনগত সমস্যায় পড়লে দূতাবাস ও কনস্যুলেটই তাদের প্রথম ও প্রধান আইনি আশ্রয়স্থল। সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বিচারাধীন প্রবাসী নাগরিকদের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা, কনস্যুলার প্রবেশাধিকার চাওয়া এবং আইনি প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা। সংশ্লিষ্ট ঘটনায় দূতাবাস ও কনস্যুলেট যথাযথ সময়ে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিল কি না, নাকি কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল–তা জনগণের সামনে স্পষ্ট করা জরুরি। এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট ঘটনার তথ্য প্রকাশ

নয়; বরং প্রবাসী দূতাবাস ও মিশনগুলোর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর সরকারের পক্ষ থেকে 'বিলম্বে অবগত হওয়া' বা 'পরে জানতে পারার' মতো অনানুষ্ঠানিক বক্তব্য রাষ্ট্রীয় সমন্বয়হীনতার ইঙ্গিত দেয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেকোনো আন্তর্জাতিক ঘটনার ক্ষেত্রে আগাম তথ্য পাওয়া এবং তা কূটনৈতিক চ্যানেলে দ্রুত আদান-প্রদান করা পেশাদারিত্বের প্রাথমিক শর্ত। একটি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে এ ধরনের ঘটনায় অনানুষ্ঠানিক মন্তব্যের পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট, তথ্যভিত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বক্তব্য বা রিপোর্ট পেশ করা আবশ্যক, যাতে সরকারের নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, 'দুই বাংলাদেশী নাগরিকের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনায় তথ্য আদান-প্রদান ও কূটনৈতিক যোগাযোগে ঘাটতি ছিল।' সরকারি পর্যায়ে আপিল আদালতের রায়ের কপি পাওয়া গেলে পূর্বাপর ঘটনা আরও স্পষ্ট হবে।

সৌদি আরব বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। মধ্যপ্রাচ্য তো বটেই, প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয় পাঠানোর তালিকায় সৌদি আরব বিশ্বেই শীর্ষস্থানীয় দেশ। সৌদিতে বর্তমানে ৫০ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করছেন। এর মধ্যে ৩৫ লাখ ইকামাধারী এবং বাকি ১৫ লাখ অবৈধ; যাঁদের অনেকেই পাসপোর্ট-ভিসা জটিলতা বা ইকামা নবায়নে দীর্ঘসূত্রতার শিকার। তাঁদের শ্রম ও ঘামে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কেবল সৌদি আরব থেকেই রেমিট্যান্স এসেছে ৫ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ ৭২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। অর্থনৈতিক অবদানের পাশাপাশি এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন, আইনি সুরক্ষা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। দূতাবাস ও কনস্যুলেটে লেবার উইং রয়েছে, যেখানে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, কর্মরতদের আরও সক্রিয় ও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

নজরুল ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে সৌদি আরব যান ২০২২ সালে। আট মাসের মাথায় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং এর একদিন পর আটক হন সুইটি বেগম। নজরুলের বিরুদ্ধে সাইবার আইন লঙ্ঘন এবং সুইটির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয়। এ তথ্য সৌদি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কনস্যুলেটকে লিখিতভাবে জানিয়েছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে সৌদি কর্তৃপক্ষ দুই হাজার পাঁচ শ বন্দীর যে তালিকা দেয়, তাতে নজরুল ও সুইটির নামও ছিল। কিন্তু কনস্যুলেট যথাসময়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব বা মনোযোগ দেয়নি।

বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দূতাবাস বা কনস্যুলেটে জনবলের অভাব রয়েছে; ফলে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। সরকারি মুখপাত্রের এই মন্তব্য এক অর্থে প্রশাসনের সীমাবদ্ধতারই চিত্র ফুটিয়ে তোলে। তিন বছর বিচারিক কার্যক্রম চলার পর গত ১৪ অক্টোবর তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। বন্দীদের তালিকা হাতে থাকার পরও জেদ্দা কনস্যুলেট বিচারাধীন মামলাগুলোর ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেনি। এমনকি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগেও সৌদি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশকে কিছু জানায়নি, যা পরে সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) খবরের মাধ্যমে জানাজানি হয়। অথচ ১৯৬৩ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের ৩৬ নম্বর ধারায় দণ্ডিত ব্যক্তির দেশকে বিষয়টি জানানোর স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা সৌদি সরকার অনুসরণ করেনি। উল্লেখ্য, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কয়েক দিন আগে নজরুল তাঁর বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেন; এর আগেও তিনি জেলখানা থেকে পরিবারের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯ অক্টোবর জেদ্দায় বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালকের সাথে এক বৈঠকে অংশ নেন। ওই বৈঠকে জানানো হয়, ২০২৩ সালের আগস্টে গ্রেপ্তারের পর যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রথমে নিম্ন আদালত দুই আসামিকে দণ্ড দেন। পরবর্তীতে আপিল আদালতে ১৩ জন বিচারক নিয়ে গঠিত প্যানেল নিম্ন আদালতের মৃত্যুদণ্ডের রায় বহাল রাখেন। আদালতের রায় অনুযায়ী নারী ও পুরুষদের জন্য নির্ধারিত পৃথক সেলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল এ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু অসঙ্গতির বিষয় তুলে ধরেন। বিশেষ করে, দণ্ড কার্যকরের আগে বিষয়টি কনস্যুলেটকে অবহিত করা হলে তাঁদের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেত। বাদশাহর কাছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আবেদন করা হলে তিনি যেকোনো অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রচেষ্টায় ২০২১ সালে সৌদি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের গভর্নর এক বাংলাদেশীকে ক্ষমা করে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেন এবং তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

সরকারিভাবে তথ্য না জানানোর কারণে দেশ ও প্রবাসের নেটজগতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এই সুযোগে অনেকে ভিউ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মুখরোচক তথ্য ও কল্পকাহিনিযুক্ত ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করছেন, ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। নজরুলের বাড়িতে মাতম চললেও সুইটি বেগমের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না; কেবল তাঁর বাড়ি টাঙ্গাইলে—এটুকু জানা গেছে।

সঙ্গত কারণেই বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন:

- ক. অপরাধের মাত্রা ঠিক কতটুকু ছিল? চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে 'হদ' জারি করতে হয়, যার প্রমাণের শর্ত অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু বিচারক তা'জিরের (বিচারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা) প্রয়োগ করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ফিকাহবিদদের মতে, তা'জিরের ক্ষেত্রে সাধারণত বেত্রাঘাতের শাস্তি বেশি প্রচলিত।
- খ. দণ্ডিত ব্যক্তিদ্বয় আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিলেন কি না এবং সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত



আইনি সহায়তা পেয়েছিলেন কি না।

- গ. দূতাবাস বা কনস্যুলেটের কোনো গাফিলতি ছিল কি না, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।
- ঘ. নজরুল জেলখানা থেকে বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলেও সুইটি আক্তার সে সুযোগ পেয়েছিলেন কি না।
- ঙ. দোভাষী তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছিলেন কি না। কনস্যুলেট থেকে দোভাষী নিয়োগ করা হলে ভাষার কারণে কোনো অস্পষ্টতা তৈরি হতো না।

তা'জির দণ্ডের পরিধি ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা

তা'জিরের আওতায় মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বৈধতা ও পরিধি নিয়ে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। দৈনিক নয়া দিগন্ত-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. আহমদ আলী বলেন, কিছু ফকিহ বিশেষ পরিস্থিতিতে গুরুতর ও ব্যাপক ক্ষতিকর অপরাধের ক্ষেত্রে এবং জননিরাপত্তা রক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনে এমন দণ্ডের অবকাশ রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে, এ ধরনের দণ্ডের পরিধি ও প্রয়োগে অধিকতর সীমাবদ্ধতার পক্ষেও জোরালো মত রয়েছে। অতএব, তা'জিরের আওতায় মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাব্য বৈধতা স্বীকার করলেই যেকোনো অপরাধে এমন দণ্ড প্রদানকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈধ বা ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–কোনো ঘটনাকে সাধারণভাবে 'অনৈতিক কর্মকাণ্ড' হিসেবে বর্ণনা করা হলে, তার ভিত্তিতে সেটিকে জিনা বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায় না। এ জন্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা, প্রমাণ এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত জানা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, ইসলামী ফিকহে জিনা-সংক্রান্ত দণ্ডের বিধান স্বতন্ত্র আইনগত কাঠামোর অধীন; হুদুদ-সংক্রান্ত বিধান এবং তা'জিরের আওতায় বিবেচিত অপরাধকে এক করে দেখা ঠিক নয়। সুতরাং, আলোচ্য ঘটনায় যদি তা'জিরের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে, তবে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে: অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ঠিক কোন অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল? অপরাধ কতটা গুরুতর ছিল? দণ্ড নির্ধারণে কোন আইনতাত্ত্বিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল এবং অপেক্ষাকৃত কম কঠোর দণ্ডের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড কেন অনিবার্য বিবেচিত হলো? এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর ছাড়া দণ্ডটি ইসলামী বিচারব্যবস্থার দৃষ্টিতে যথার্থ ও আনুপাতিক ছিল কি না–সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। সৌদি সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা জনসমক্ষে তুলে ধরলে বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং বিশ্বজনমনে ইসলামী দণ্ডবিধি ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় সংশয় সৃষ্টির সুযোগ কমবে।

স্মর্তব্য যে, সৌদি আরবের বিভিন্ন কারাগারে চারিত্রিক স্খলনের মামলায় বর্তমানে ৩০৬ জন বাংলাদেশী আটক রয়েছেন। এর মধ্যে ১৪৭ জন বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগ করছেন, যাঁদের সর্বনিম্ন এক মাস থেকে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সাইবার অপরাধে মক্কায় তিনটি মামলায় তিন বাংলাদেশীকে সর্বনিম্ন ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১১ সালের ৭ অক্টোবর এক মিসরীয় প্রহরীকে হত্যার অভিযোগে আট বাংলাদেশী শ্রমিকের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে রক্তপণ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও নিহতের আত্মীয়স্বজন তা গ্রহণে রাজি হননি; ফলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

আগাম আইনি সুরক্ষাব্যবস্থা

প্রবাসীরা যেন ভিনদেশের বিচারব্যবস্থায় কোনো অমানবিক পরিস্থিতি বা আইনি সহায়তাহীনতার শিকার না হন, সে জন্য দ্বিপক্ষীয় আইনি চুক্তি জোরদার করা এবং স্থায়ী আইনি সহায়তা ফান্ড বা প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনার পর কেবল রাজনৈতিক বা আবেগঘটিত আলোচনা-সমালোচনা সমস্যার স্থায়ী সমাধান আনতে পারে না। এই ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা হিসেবে না দেখে বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দুর্বলতা চিহ্নিত করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বিচারিক প্রক্রিয়ার কোথায় ঘাটতি ছিল এবং কনস্যুলার যোগাযোগে কী ধরনের বিলম্ব ঘটেছে–তার একটি গভীর ও নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার মাধ্যমেই ভবিষ্যতে অন্য কোনো প্রবাসীর ক্ষেত্রে যেন অনুরূপ পরিস্থিতি না ঘটে, তার স্থায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

সংক্ষেপে, এ বিষয়টি কোনো ব্যক্তি বা দলের রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়; বরং এটি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সক্ষমতা এবং প্রবাসী নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। একটি স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল এবং দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতিই পারে বিদেশে অবস্থানরত কোটি প্রবাসী ও রেমিট্যান্স যোদ্ধার নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদা সুসংহত করতে, যাঁদের ঘাম ঝরানো অর্থে পুষ্ট হচ্ছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি। ■



ওআইসির মহাসচিব ইসমাইল উলদ শেখ আহমেদ

অধিকৃত জেরুজালেমে কলম্বিয়ার দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ওআইসির

আল-উম্মাহ বিশ্লেষণ

অধিকৃত জেরুজালেমে কলম্বিয়ার দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)। সংস্থাটি এই পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলোর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে।

গত ১৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ওআইসির মহাসচিব ইসমাইল উলদ শেখ আহমেদ বলেন, কলম্বিয়ার এই সিদ্ধান্ত ১৯৮০ সালে গৃহীত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৪৭৮ নম্বর প্রস্তাবের পরিপন্থী। ওই প্রস্তাবে বিভিন্ন দেশকে জেরুজালেম থেকে তাদের কূটনৈতিক মিশন প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছিল। একই সঙ্গে শহরটির চরিত্র ও মর্যাদা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইসরাইলের নেওয়া সব পদক্ষেপকে বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করা হয়েছিল।

ওআইসি এমন যেকোনো অবস্থান বা পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছে, যা ইসরাইলের দখলদারিত্বকে আরও জোরদার করে, অধিকৃত জেরুজালেমের ওপর দেশটির দাবিকৃত সার্বভৌমত্বকে বৈধতা দেয় কিংবা দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের ভিত্তিতে ন্যায়সংগত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে।

ওআইসি মহাসচিব জানান, কলম্বিয়াকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

তিনি বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ জেরুজালেমের ঐতিহাসিক চরিত্র, আইনি মর্যাদা ও জনসংখ্যাগত বিন্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইসরাইলের গৃহিত নীতিগুলোকে উৎসাহিত করে; যা ফিলিস্তিনি জনগণের মৌলিক অধিকারকেও ক্ষুণ্ন করে।

বিশ্বের মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে জেরুজালেমের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে ইসমাইল উলদ শেখ আহমেদ সতর্ক করে বলেন, কলম্বিয়ার এই সিদ্ধান্তের ফলে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে দেশটির সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ■

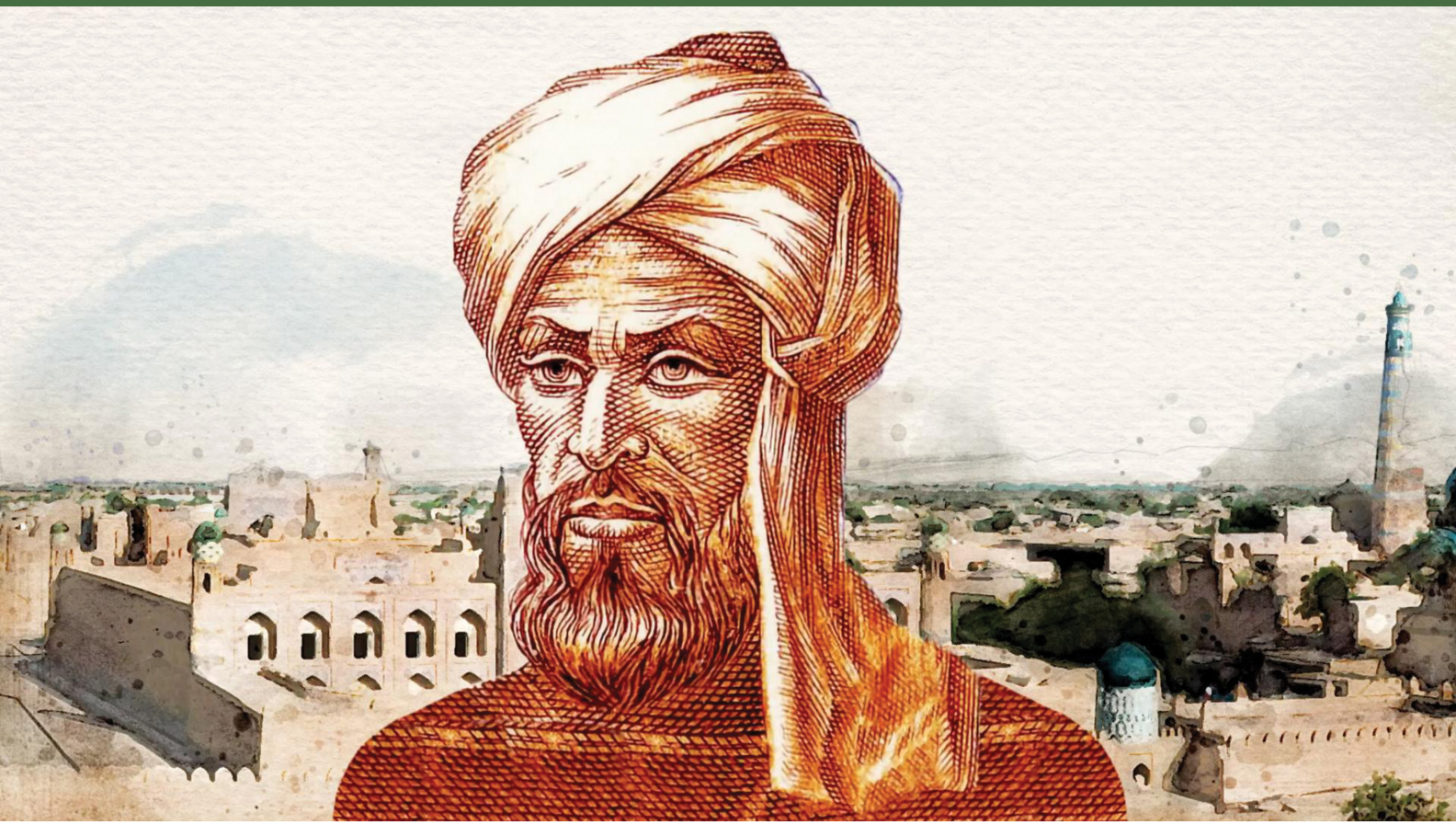

মুসলিমদের নবজাগরণের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা

মানসম্মত, যুগোপযোগী ও জ্ঞান-বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাই মুসলিম উম্মাহর ভাগ্য বদলে দিতে পারে এবং নবজাগরণের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।



ডা. বশীর আহমেদ, M.D
মনোরোগবিদ্যার সাবেক অধ্যাপক, সাউথওয়েস্টার্ন মেডিকেল স্কুল, ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র

"মুসলিমদের অবদান ইউরোপের এলিজাবেথীয় যুগের নবজাগরণের পথ সুগম করেছিল। পরবর্তী সময়ে তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রতিফলিত গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং দেশটির বর্তমান আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠতেও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।"
– এইচ. জে. মরোউইৎস, ইতিহাসবিদ

আল-খোয়ারিজমির বীজগণিত, ইবনে সিনার চিকিৎসাবিদ্যা, ইবনে আল-হাইসামের আলোকবিজ্ঞান, আল-বিরুনির বিজ্ঞানচর্চা এবং আল-জাজারির প্রকৌশলবিদ্যা–মুসলিম মনীষীদের এসব অবদান বিশ্বজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে এবং ইউরোপীয় নবজাগরণের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণীর সূচনা 'ইকরা' শব্দ দিয়ে, যার অর্থ 'পড়ো'। জ্ঞান অর্জনের প্রতি ইসলামের এই আহ্বান আরও স্পষ্ট হয়েছে পবিত্র কুরআনের এই দোয়ায়–"হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" (সূরা ত্বা-হা, ২০:১১৪)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'একজন আলেমের (জ্ঞানীর) কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।' আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান ও বিবেকের বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। এই ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার মানুষকে যুক্তিনির্ভর চিন্তা করতে, কোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার করতে এবং বিচক্ষণ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম মনীষীরা স্থাপত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাহ বা 'জ্ঞানভবন' বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্ডিত ও জ্ঞানসাধকদের আকৃষ্ট করেছিল।

অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড, গ্যালেন, টলেমি ও সক্রেটিসের মতো প্রাচীন বিশ্বের বহু মনীষীর রচনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাগদাদ, কায়রো ও কর্ডোভার মতো গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নগরে উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় মুসলিম বিশ্ব একসময় বিশ্বনেতৃত্বের আসনে পৌঁছেছিল। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা মুসলিম নগরগুলোতে আসতেন। ইউরোপে জটিল চোখের অস্ত্রোপচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার বহু শতাব্দী আগেই মুসলিম চিকিৎসকেরা এ ধরনের অস্ত্রোপচারে উচ্চদক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পরিধি ও বিভিন্ন পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্ণয়েও groundbreaking বা যুগান্তকারী কাজ করেন। ভারতীয় গণিত থেকে শূন্যের ধারণা ও দশমিক পদ্ধতির বিকাশে মুসলিম গণিতবিদেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা গণনা ও গাণিতিক হিসাব-নিকাশকে অনেক সহজ করে তোলে। জ্ঞানের এমন কোনো শাখা ছিল না, যেখানে মুসলিম মনীষীরা অনুসন্ধান, গবেষণা বা নতুন উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাননি।

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে ইবনে আল-বাইতার, ইবনে আল-নাফিস, নাসির আল-দীন আল-তুসি, আল-বাত্তানি, ওমর খৈয়াম, আল-কিন্দি, আল-বিরুনি, সাবিত ইবনে কুররা, আল-জাহরাবি, জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-খোয়ারিজমি, মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজি, ইবনে আল-হাইসাম, ইবনে খালদুন, ইবনে রুশদ, ইবনে বতুতা, আল-ইদ্রিসি ও ইবনে সিনা (অ্যাভিসেনা) অন্যতম। ইবনে সিনার চিকিৎসাবিষয়ক বিশ্বকোষ 'দ্য ক্যানন অব মেডিসিন' দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল পাঠ্য ও তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পশ্চিমা ইতিহাসচর্চার কিছু ধারায় প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার আলোচনা শেষে সরাসরি ইউরোপীয় নবজাগরণের সময়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে সপ্তম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় আট শ বছরের ইতিহাসে মুসলিম বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিষয়টি অনেক সময় যথাযথ গুরুত্ব পায় না।

ইতিহাসবিদ এইচ. জে. মরোউইৎস এই ঘটনাকে 'ইতিহাসের ব্ল্যাক হোল' (History's Black Hole) হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন: "এমন এক ধারণা দেওয়া হয় যেন রেনেসাঁ গ্রীস ও রোমের ক্লাসিক্যাল যুগের ছাই থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছিল–যা এক সহস্রাব্দ ধরে সুপ্ত ছিল।" প্রকৃতপক্ষে, তার পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিমদের অবদানই এলিজাবেথীয় যুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁর পথ সুগম করেছিল এবং পরিশেষে আমাদের সংবিধানের সংজ্ঞায়িত গণতান্ত্রিক আদর্শের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিবেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

মুসলিম উম্মাহর পতন

একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিতদের একাংশের মাঝে ঐশ্বরিক বা প্রকাশিত জ্ঞান ('কুরআন সংক্রান্ত') এবং যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের উৎসের পৃথকীকরণের প্রবণতা দেখা দেয়।

তারা ঐশ্বরিক উৎসের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়ে যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানকে নিকৃষ্ট বলে দাবি করতে শুরু করেন; তাঁদের মতে, এই জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তাই একে বর্জন করা উচিত। এর ফলে ইসলামী অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষাদান থেকে সরে আসে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বাদ দিয়ে কেবল কুরআন তিলাওয়াত এবং ফিকহ (ধর্মীয় আইনশাস্ত্র)–যা মুসলিমদের জন্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ–অত্যন্ত বিশদভাবে শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে তা বাকস্বাধীনতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ছাড়াই পরিচালিত হতে থাকে।

মহান রেনেসাঁ আন্দোলন ইউরোপকে একটি গতিশীল ও প্রগতিশীল সভ্যতায় রূপান্তরিত করলেও গোঁড়া ও কঠোর নীতিবাগীশ আইনবিদদের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে প্রতিবেশী ইসলামী দেশগুলোতে তার কোনো প্রভাব পড়েনি; কারণ তারা কেবল গোঁড়ামিকেই টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিল।

উপনিবেশ-উত্তর মুসলিম দেশগুলো জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা জোরদার করতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। এর ফলে মুসলিমদের দীর্ঘকাল ধরে এই অজ্ঞতার খেসারত দিতে হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিগত বিপ্লবে–যা বিশ্বকে আমূল বদলে দিয়েছে–মুসলিম দেশ ও বিজ্ঞানীদের অবদান অত্যন্ত সীমিত।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের শিক্ষাগত অবস্থান

- ৫টি মুসলিম দেশে মাত্র ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই ৫,৭৫৮টি এবং ভারতে ৮,৪০৭টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।
- সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও বিশ্বের শীর্ষ ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পায়নি।
- খ্রিস্টান বিশ্বে সাক্ষরতার হার ৯০ শতাংশ, অথচ মুসলিম বিশ্বে তা ৪০ শতাংশের কাছাকাছি (যেখানে মুসলিম নারীদের নিরক্ষরতার হার অনেক বেশি)।
- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে প্রতি দশ লাখ মানুষে মাত্র ২৩০ জন বিজ্ঞানী রয়েছেন, বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি দশ লাখে ৫,০০০ জন বিজ্ঞানী রয়েছেন।



সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক শৃঙ্খলা পুনর্গঠনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় দক্ষ মুসলিম বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে পারে–এমন একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সময়ের দাবি।

ঙ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা ১.৬ বিলিয়নেরও বেশি। তুলনামূলকভাবে ইহুদিদের সংখ্যা প্রায় ১৪.৪ মিলিয়ন হলেও ১৯৩ জন ইহুদি নোবেল বিজয়ী রয়েছেন, যা মাত্র ১২ জন নোবেল বিজয়ী মুসলিমদের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী কিছু মুসলিম এখনও বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের 'ইসলামীকরণ' নিয়ে ব্যস্ত। মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা নিরপেক্ষভাবে পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে তাতে নিজেদের মৌলিক অবদান যুক্ত করেছিলেন। ইবনে সিনার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ কেবল তিনি মুসলিম ছিলেন বলেই 'ইসলামী' হয়ে যায়নি; ঠিক যেমন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি তিনি ইহুদি বলেই 'ইহুদি পদার্থবিজ্ঞান' নয়, কিংবা আইজ্যাক নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বটি তিনি খ্রিস্টান ছিলেন বলেই 'খ্রিস্টান তত্ত্ব' নয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠতা ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, বিজ্ঞানীর ধর্মের ওপর নয়। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বহু ধনী মুসলিম দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও গবেষক তৈরিতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করে না।

উপসংহার

মুসলিম বিশ্বের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি, যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, অর্থনীতি, মানবিক বিদ্যা ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় দক্ষ বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে পারে। এসব বিশেষজ্ঞ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক শৃঙ্খলা পুনর্গঠন এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।

মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একদিকে যেমন ইসলামের শাশ্বত নৈতিক মূল্যবোধ ধারণ করবে, অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও সক্ষম হয়ে উঠবে। ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা গেলেই কেবল মুসলিম সমাজ নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারবে।

বিশেষ করে, নারীদের শিক্ষা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। শিক্ষিত নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই মুসলিম নারীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জ্ঞানচর্চা ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন নতুন সম্ভাবনার পাশাপাশি নানা জটিল চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এসব সমস্যা মোকাবিলা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন যুক্তিনির্ভর চিন্তা, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রশ্ন করার মানসিকতা ও সমালোচনামূলক বিচারবোধ। তাই মুসলিম বিশ্বে প্রকৃত নবজাগরণ আনতে হলে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতীতের সোনালী গৌরব স্মরণ করার পাশাপাশি সেই গৌরবের নেপথ্যে থাকা জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, অনুসন্ধান ও উদ্ভাবনের চেতনাকে আমাদের জীবনে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ■

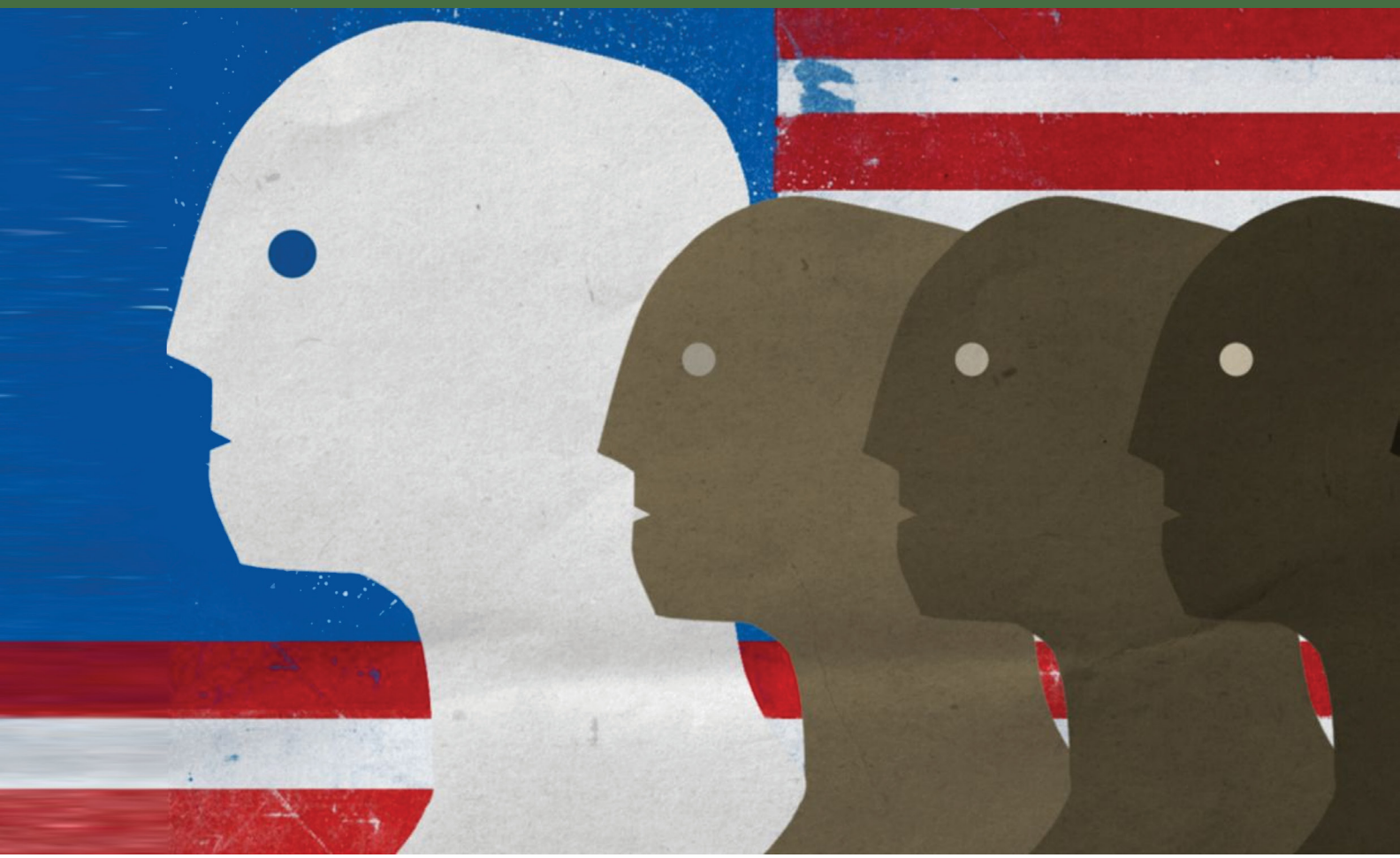

শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের পুনরুত্থান: ঘৃণা ও বিভাজনের রাজনীতির নেপথ্যে বর্ণবাদ



প্রফেসর ড. শাহজাহান খান (OAM)

অস্ট্রেলিয়ার সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের প্রবাসী ফেলো এবং ঢাকার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সাবেক উপাচার্য।

শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ কেবল বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাসে এই মতাদর্শ আধিপত্য বিস্তার, অন্যদের বর্জন এবং শোষণকে বৈধতা দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমকালীন পশ্চিমা সমাজেও এর বিভিন্ন রূপ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বিশেষ করে, অভিবাসী, মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জাতীয় পরিচয় এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরে–এমন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

এই মতাদর্শের কেন্দ্রে রয়েছে একটি পরিচিত বিভাজন–'আমরা' বনাম 'তারা'। এর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠী অন্যদের তুলনায় বেশি অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

সময়ের সঙ্গে ভাষা ও উপস্থাপনার ধরন বদলালেও এর মূল যুক্তি প্রায় একই রয়ে গেছে: একটি গোষ্ঠীকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, অন্য একটি গোষ্ঠীকে হুমকি হিসেবে চিত্রিত করা এবং সেই বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে বৈষম্যকে ন্যায্য বলে প্রতিষ্ঠা করা।

বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্ত ধারণা (মিথ)

শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী মতাদর্শ ঐতিহাসিকভাবে এই দাবির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত মানুষ অন্য যেকোনো জনগোষ্ঠীর তুলনায় শারীরিকভাবে শক্তিশালী, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উন্নত এবং নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এসব ধারণা কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নয়; বরং বর্ণবাদী পূর্বধারণা ও কুসংস্কারের বহিঃপ্রকাশ। বৈষম্য, ঔপনিবেশিক আধিপত্য এবং ক্ষমতা ও সুযোগের অসম বণ্টনকে বৈধতা দিতেই এসব ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বিদেশি ভূখণ্ড দখল, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে শোষণ এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে সভ্যতা, অগ্রগতি ও বর্ণগত শ্রেণিবিন্যাসের ধারণা ব্যবহার করেছে। সামরিক ও প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব তাদের বিজয় অর্জনে সহায়তা করেছিল। কিন্তু অন্যদের পরাজিত বা দমন করার সামর্থ্য কখনোই তাদের ওপর শাসন করার নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না।

এই ইতিহাসের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকগুলোর একটি হলো বর্ণবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা। ইউজেনিক্স বা সুপ্রজননবিদ্যার ইতিহাস এই বিপদের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ।

ইউজেনিক্স: কুসংস্কার যখন বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ ধারণ করে

'ইউজেনিক্স' শব্দটি ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস গালটন প্রবর্তন করেন। এই মতবাদের সমর্থকেরা মানুষের বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে জনসংখ্যার কথিত উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেদের বিবেচনায় কাঙ্ক্ষিত বংশগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের মধ্যে প্রজননে উৎসাহ দিতেন এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের প্রজনন নিরুৎসাহিত বা প্রতিরোধের পক্ষে অবস্থান নেন।

বৈজ্ঞানিকতার দাবি করা হলেও ইউজেনিক্সের ভিত্তি ছিল বংশগতি, বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক শ্রেণি এবং মানুষের মূল্য সম্পর্কে নানা ত্রুটিপূর্ণ অনুমান। এই মতবাদ প্রায়ই সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্যকে জৈবিক হীনতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত। মানুষের জটিল বৈশিষ্ট্যগুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনতার সরল শ্রেণিবিন্যাসে সীমাবদ্ধ করে দেখানো হতো।

ইউজেনিক্সের ধারণা বিবাহের ওপর বিধিনিষেধ, জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পৃথকীকরণের মতো নীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চরম পর্যায়ে বর্ণবাদী ও ইউজেনিক্সভিত্তিক মতাদর্শ নিপীড়ন এবং গণহত্যার পক্ষে যুক্তি তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। নাৎসি জার্মানির ইতিহাস দেখিয়ে দেয়, কারা স্বাধীনতা, মর্যাদা ও মৌলিক মানবাধিকারের যোগ্য, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছদ্মবৈজ্ঞানিক দাবিকে প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে।

ইউজেনিক্সের ইতিহাস আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আনে: খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরাও তাঁদের সময়ের প্রচলিত কুসংস্কার ও পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে নাও থাকতে পারেন। আধুনিক পরিসংখ্যান ও জনসংখ্যা জিনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ রোনাল্ড এ. ফিশার ছিলেন ইউজেনিক্সের একজন সুপরিচিত সমর্থক। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাঁর উত্তরাধিকার কীভাবে মূল্যায়ন করা উচিত, তা নতুন করে বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে।

কোনো বিজ্ঞানীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে তাঁর প্রচারিত ক্ষতিকর ধারণাগুলো উপেক্ষা করতে হবে। বৈজ্ঞানিক কর্তৃত্ব থাকলেই কোনো ব্যক্তির সব মতামত প্রমাণসমর্থিত হয়ে যায় না। বিজ্ঞানকে তাই সব সময় যাচাই-বাছাই, নৈতিক পর্যালোচনা এবং ইতিহাসের আলোকে পুনরমূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া: অভিবাসন ও বর্ণগত বর্জনের ইতিহাস

ব্রিটেনে ইউজেনিক্সের ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বংশগতি, দারিদ্র্য, জাতীয় পরিচয় ও জনসংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কেও এর প্রভাব পড়ে। ১৯০৫ সালের 'অ্যালিয়েন্স অ্যাক্ট' অভিবাসনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, যার প্রভাব বিশেষ করে ইহুদি শরণার্থীদের মতো কিছু অভিবাসী গোষ্ঠীর ওপর পড়েছিল।

পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ অভিবাসন নীতি বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এসব ঘটনাকে একটি অবিচ্ছিন্ন ইউজেনিক্স কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। তবে অভিবাসন ও জাতীয় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জনপরিসরের বিতর্কে বর্ণবাদী চিন্তাভাবনার প্রভাব ছিল–এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সরকারি নীতির মধ্যে বর্ণবাদী মতাদর্শ কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে পারে, তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ অস্ট্রেলিয়া। ১৯০১ সালে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার পর দেশটির বিভিন্ন সরকার প্রধানত শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যা বজায় রাখার লক্ষ্যে

নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে। 'হোয়াইট অস্ট্রেলিয়া পলিসি' বা 'শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়া নীতি' নামে পরিচিত এই ব্যবস্থা ধাপে ধাপে বিলুপ্ত করা হয়; বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ ও ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকের সংস্কারগুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এই নীতির পেছনে বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ, শ্রমবাজার নিয়ে উদ্বেগ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যসহ বিভিন্ন বিষয় কাজ করেছিল। ইউজেনিক্সের যুক্তিও বংশগত পার্থক্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে তুলে ধরে বর্ণগত বর্জনকে আরও জোরদার করেছিল। এর ফলে বৈষম্যমূলক নীতিগুলোকে অন্যায় না ভেবে যুক্তিসংগত বলে উপস্থাপন করা সহজ হয়েছিল।

এর পরিণতি ছিল সুদূরপ্রসারী। বংশপরিচয়ের কারণে অনেক মানুষ নানা বাধার সম্মুখীন হন। একই সঙ্গে বর্ণবাদী বিধিনিষেধ অস্ট্রেলীয় সমাজে অবদান রাখা বহু মানুষের সুযোগ ও অধিকার সীমিত করে দেয়।

আফগান উটচালকদের ইতিহাস এ ক্ষেত্রে এক গভীর বৈপরীত্য তুলে ধরে। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত আফগানিস্তান ও আশপাশের অঞ্চল থেকে আসা উটচালকেরা অস্ট্রেলিয়ার শুষ্ক অভ্যন্তরীণ অঞ্চল উন্মোচন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের উটের মাধ্যমে পানি, খাদ্য, সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিবহন করা হতো। এসব পরিবহন অভিযান, পশুপালন, প্রত্যন্ত জনবসতি গড়ে তোলা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করেছিল।

কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পরও তাঁরা সমান স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাননি। অভিবাসনসংক্রান্ত বিধিনিষেধ এবং বৈষম্যমূলক মনোভাবের কারণে তাঁদের অনেকের পক্ষেই পরিবারকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসা কিংবা সেখানে নিরাপদ ও স্থায়ী জীবন গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে মোটরযান ও রেলপথ উটনির্ভর পরিবহনের জায়গা দখল করলে তাঁদের অনেকেই জীবিকা হারান।

অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়নে তাঁদের অবদান এবং তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে রয়েছে এক গভীর বৈপরীত্য। তাঁদের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আনে: একটি সমাজ কীভাবে বিভিন্ন পটভূমির মানুষের শ্রম, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে, অথচ একই সঙ্গে তাঁদের সমান অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারে?

ঔপনিবেশিকতা ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বৈপরীত্য

আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস সহজাত বর্ণগত বা নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে গুরুতরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো প্রায়ই নিজেদের সভ্যতা ও আলোকিত চিন্তার বাহক হিসেবে উপস্থাপন করত। অথচ তাদের শাসনের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে যুক্ত ছিল ভূমি দখল, জোরপূর্বক শ্রম আদায়, সম্পদ লুণ্ঠন, সাংস্কৃতিক দমন, বর্ণগত বৈষম্য ও সহিংসতা।

যেসব সমাজ স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার কথা বলত, তারাই প্রায়ই ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এসব নীতি অস্বীকার করত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সম্পদ সঞ্চয়ের পেছনে অনেক সময় তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডের সম্পদ ও শ্রম আত্মসাতের ভূমিকা ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন এবং অসম অর্থনৈতিক সম্পর্ক এমন বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল, যার প্রভাব আনুষ্ঠানিক ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়ে গেছে। তবে আধুনিক বিশ্বের সম্পদবৈষম্যের প্রতিটি কারণকে শুধু ঔপনিবেশিক ইতিহাস দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

একটি সমাজের নৈতিকতার প্রকৃত পরীক্ষা হলো না, সেটি কতটা দক্ষতার সঙ্গে অন্যদের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে–বরং পরীক্ষা হলো, অন্যদের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সেটি কতটা ধারাবাহিকভাবে সম্মান দেখায়। শক্তি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়, আর আধিপত্য বিস্তারও নৈতিক মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।

সমকালীন ঘৃণা ও বিভাজনের রাজনীতি

বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের জৈবিক তত্ত্বগুলো বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতা হারালেও বর্ণবাদী রাজনৈতিক বয়ান এখনো টিকে আছে। সমকালীন কিছু অতি-ডানপন্থী আন্দোলন অভিবাসন, ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে মানুষের উদ্বেগকে কাজে লাগায়। তারা অভিবাসনকে জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরতে পারে, সংখ্যালঘুদের সহজাতভাবে বিপজ্জনক বলে চিত্রিত করতে পারে কিংবা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও জনসেবার ওপর চাপের জন্য বহিরাগতদের দায়ী করতে পারে।

এ ধরনের বক্তব্য জটিল সামাজিক সমস্যাকে অতিসরলভাবে উপস্থাপন করে। কাঠামোগত অর্থনৈতিক সংকট, সুযোগের অসমতা কিংবা শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা মোকাবিলা করার পরিবর্তে মানুষের ক্ষোভকে দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এর ফলে সামাজিক বিভাজন আরও গভীর হতে পারে, পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হতে পারে এবং বৈষম্যমূলক নীতির পক্ষে জনসমর্থন বাড়তে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার পলিন হ্যানসন, যুক্তরাজ্যের নাইজেল ফারাজ, নেদারল্যান্ডসের গিয়ার্ট উইল্ডার্স, ফ্রান্সের মারিন ল্য পেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বক্তব্য ও নীতি অভিবাসন, জাতীয় পরিচয় এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান ও আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের সবাইকে একই ধরনের রাজনীতিক কিংবা সরাসরি শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত করা যথাযথ হবে না।

তবু তাঁদের রাজনৈতিক গুরুত্বের একটি দিক হলো, জাতীয় পরিচয় ও অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের দাবি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের



ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা। রাজনৈতিক বক্তব্য ও নীতির মূল্যায়নে তাই সেগুলোর বাস্তব পরিণতি বিবেচনা করা জরুরি।

অভিবাসন নীতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কিংবা সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেই তাকে বর্ণবাদ বলা যায় না। গণতান্ত্রিক সমাজে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সংহতি, জনসেবা এবং জাতীয় পরিচয় নিয়ে বিতর্কের সুযোগ থাকা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসব বিতর্ক তথ্য-প্রমাণ ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, নাকি বর্ণবাদী পূর্বধারণা, সামষ্টিক দোষারোপ এবং মৌলিক অধিকার অস্বীকারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

বিপদ তৈরি হয় তখন, যখন রাজনৈতিক নেতারা বৈধ নীতিগত প্রশ্নকে একটি সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অভিযানে পরিণত করেন। তখন মতপার্থক্য থেকে জন্ম নিতে পারে অমানবিকীকরণ, আর বৈষম্যকে দেশপ্রেমের নামে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা চলে।

বিজ্ঞান, মানবিক মর্যাদা ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ইউজেনিক্স, ঔপনিবেশিকতা এবং বর্ণবাদী অভিবাসন নীতির ইতিহাস আমাদের একটি স্থায়ী সতর্কবার্তা দেয়: বিজ্ঞান, জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ভাষার আড়ালে বৈষম্যকে লুকিয়ে রাখা হলে তা একসময় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার 'হোয়াইট অস্ট্রেলিয়া পলিসি' ছিল জাতি গঠনের নামে বর্ণগত বিভাজন প্রতিষ্ঠার একটি প্রকল্প। ইউজেনিক্সের যুক্তি এর কিছু সমর্থককে এই বর্জনমূলক নীতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল।

দায়িত্বশীল বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজন কঠোর তথ্য-প্রমাণ, স্বচ্ছ পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠিত ধারণাকেও প্রশ্ন করার মানসিকতা। পরিসংখ্যান, জিনতত্ত্ব ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শাখা মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। কিন্তু কোনো মতাদর্শ যদি আগেই ঠিক করে দেয় কোন প্রমাণ গ্রহণ করা হবে এবং কী সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে, তাহলে এসব জ্ঞানের অপব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হয়।

মানুষের সক্ষমতা, চরিত্র ও অর্জনে ব্যক্তিভেদে পার্থক্য থাকে। কিন্তু এসব পার্থক্যকে পুরো কোনো বর্ণ বা জাতিগত গোষ্ঠীর মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি বানানো যায় না। কোনো বংশপরিচয়ই কাউকে অন্যদের ওপর শাসন করার স্বাভাবিক অধিকার দেয় না। একইভাবে, আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার আগে কোনো জনগোষ্ঠীকে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য করাও উচিত নয়।

পরিশেষে বলা যায়, বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি একটি মতাদর্শগত হাতিয়ার। এর মাধ্যমে বৈচিত্র্যকে শ্রেণিবিন্যাসে, শ্রেণিবিন্যাসকে বর্জনে এবং বর্জনকে অসম ক্ষমতার কাঠামোয় রূপান্তরিত করা হয়। এই প্রবণতা প্রতিরোধ করতে হলে প্রয়োজন ইতিহাসের প্রতি সততা, তথ্যভিত্তিক বিতর্ক, জবাবদিহিমূলক নেতৃত্ব এবং সব মানুষের সমান মর্যাদার প্রতি অবিচল অঙ্গীকার।

একটি সমাজের মহত্ত্ব তার সামরিক শক্তি কিংবা অন্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের সামর্থ্য দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। বরং ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবিক মর্যাদা এবং সমান অধিকারের প্রতি তার অঙ্গীকার দিয়েই সেই সমাজের প্রকৃত মহত্ত্ব পরিমাপ করা উচিত। ■



ব্যাংক সংস্কারের কেন্দ্রে থাকুক আমানতকারীর অধিকার



মোহাম্মদ কবির হাসান, পিএইচডি
অধ্যাপক, ফিন্যান্স, নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়

ধরা যাক, রাজশাহীর একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক। তিনি কাল্পনিক চরিত্র, কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তা একেবারেই বাস্তব। পেনশনের এককালীন টাকা আর চার দশকের সঞ্চয় মিলিয়ে তিনি একটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকে মুদারাবা মেয়াদি আমানত খুলেছিলেন। ভেবেছিলেন, মাসিক মুনাফায় ওষুধের খরচ চলবে, মেয়ের পড়াশুনার জন্য মূল টাকায় হাত দিতে হবে না। গত দুই বছর তিনি শাখায় গেছেন বারবার। কখনো শুনেছেন নগদ টাকা নেই, কখনো শুনেছেন কিস্তিতে মিলবে, কখনো শুনেছেন মুনাফা কাটা যেতে পারে। এখন তাঁর প্রশ্ন একটাই: যে আস্থায় টাকা রেখেছিলাম, সেই আস্থার দায় কে নেবে?

প্রশ্নটি শুধু একজনশিক্ষকের নয়। প্রবাসে ঘাম ঝরানো শ্রমিকের পরিবার, মফস্বলের ছোট দোকানি, গ্রামের নারী উদ্যোক্তা–সবাই আজ একই প্রশ্ন করছেন। এর উত্তর দ্বারাই নির্ধারিত হবে বাংলাদেশের ব্যাংক সংস্কার সফল হয় কি না।

আমার মূল বক্তব্য সোজা: সংস্কারের সাফল্য মাপতে হবে চারটি মানদণ্ডে–আমানতকারীর সঞ্চয় কতটা নিরাপদ হলো, ঋণ কতটা ন্যায্যভাবে বণ্টিত হলো, দায়ী ব্যক্তিরা কতটা জবাবদিহির আওতায় এলেন এবং মানুষের টাকা কতটা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে গেল। ব্যাংকের স্থিতিশীলতা অবশ্যই জনস্বার্থ। কিন্তু সেই স্থিতিশীলতার নামে দায়িত্বহীন মালিক ও প্রভাবশালী ঋণগ্রহীতাদের দায়মুক্তি দেওয়া যায় না।

সংখ্যার আড়ালে মানুষের জীবন

সংকটের আকার বুঝতে কয়েকটি সংখ্যাই যথেষ্ট। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে চলতি বছরের জুন শেষে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। অর্থাৎ ব্যাংকগুলো প্রতি ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে যার প্রায় ৩৩ টাকার আদায় অনিশ্চিত। মার্চে পুরো খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত, অর্থাৎ ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন, নেমেছে ঋণাত্মক ৩ দশমিক ১৭ শতাংশে; অথচ নূনতম প্রয়োজন সাড়ে ১২ শতাংশ। এ মাসের শুরুতে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' ব্যাংক খাতকে তীব্র নাজুক অবস্থায় আছে বলে বর্ণনা করেছে এবং প্রবৃদ্ধির শ্লথগতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সংখ্যাগুলো মানুষের ঘরে পৌঁছায় অন্তত চার পথে। প্রথমত, আমানতে প্রবেশাধিকার। প্রয়োজনের সময় নিজের টাকা তুলতে না পারা শুধু অসুবিধা নয়; অনেক পরিবারের জন্য তার অর্থ চিকিৎসা পিছিয়ে যাওয়া বা সন্তানের ভর্তি আটকে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, ক্রয়ক্ষমতা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ। যে আমানত আটকে আছে বা যার মুনাফা অনিশ্চিত, তার প্রকৃত মূল্য প্রতিদিনই ক্ষয়ে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, প্রাপ্তি। দুর্বল ব্যাংক নতুন ঋণ দিতে পারে না, আর সবল ব্যাংকগুলো ঝুঁকি এড়াতে সরকারি বিল-বন্ডে টাকা রাখে। মাঝখানে বঞ্চিত হন জামানতহীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা। চতুর্থত, কর্মসংস্থান। ঋণ না পেলে কারখানা বাড়ে না, আর কারখানা না বাড়লে তরুণের চাকরিও হয় না।

তবে সততার খাতিরে বলা দরকার, অর্থনীতির সব দুর্দশার দায় ব্যাংকের নয়। জ্বালানিসংকট, দুর্বল রাজস্ব আহরণ ও বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কথাও বিশ্বব্যাংক সমান গুরুত্ব দিয়ে বলেছে। রেকর্ড রেমিট্যান্স বৈদেশিক খাতকে স্বস্তি দিয়েছে, যা প্রমাণ করে প্রবাসী শ্রমিকেরা ব্যাংকিং চ্যানেলের ওপর আস্থা রাখতে চান। কিন্তু ব্যাংক খাত অর্থনীতির রক্তসঞ্চালনব্যবস্থা। সেখানে জমাট বাঁধলে অন্য খাতের সংস্কারের সুফলও শরীরের সব অঙ্গে পৌঁছায় না।

এই সংকট কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়; এর উৎস প্রাতিষ্ঠানিক। মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, পরিচালক ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঋণ, জামানতের অতিমূল্যায়ন, দুর্বল ঋণ যাচাই, বারবার পুনঃতফসিল করে খেলাপি আড়াল করা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে তদারকির নতিস্বীকার–এসব মিলেই আজকের পরিস্থিতি।

খেলাপি ঋণের হার হঠাৎ এত উঁচুতে দেখার একটি বড় কারণও এখানে। ঋণ শ্রেণীকরণের নিয়ম আন্তর্জাতিকমানের কাছাকাছি আনার পর বহুদিন লুকিয়ে রাখা ক্ষত এখন হিসাবের খাতায় উঠে আসছে। প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পাওয়া বেদনাদায়ক, কিন্তু চিকিৎসার প্রথম শর্তই সঠিক রোগ নির্ণয়।

এখানে একটি পার্থক্য স্পষ্ট রাখা জরুরি। জ্বালানিসংকট বা চাহিদা পতনে ক্ষতিগ্রস্ত একজন সৎ উদ্যোক্তা আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে টাকা ফেরত না দেওয়া প্রভাবশালী ঋণগ্রহীতা এক নন। প্রথমজনের প্রয়োজন স্বচ্ছ শর্তে পুনর্গঠন; দ্বিতীয়জনের প্রাপ্য আইনের পূর্ণ প্রয়োগ। দুজনকে এক পাল্লায় মাপলে সৎ উদ্যোক্তা শাস্তি পান, আর ইচ্ছাকৃত খেলাপি পান আড়াল। তাই ইচ্ছাকৃত খেলাপি চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া হতে হবে প্রমাণনির্ভর ও আদালতে টেকসই। তালিকার প্রকাশের রাজনীতি নয়, সম্পদ উদ্ধারের ফলাফলই হবে মাপকাঠি।

ক্ষতির দায় কার ঘাড়ে?

সংস্কারের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন, ক্ষতি কে বহন করবে? পক্ষ চারটি: শেয়ারহোল্ডার ও উদ্যোক্তা-মালিক, দায়ী ঋণগ্রহীতা, করদাতা এবং আমানতকারী। ন্যায্যক্রমটিও এটিই। যাঁরা ব্যাংক চালিয়েছেন ও লাভের ভাগ নিয়েছেন, ক্ষতির প্রথম আঘাত পড়বে তাঁদের মূলধনে। যাঁরা টাকা সরিয়েছেন, তাঁদের সম্পদ থেকে আদায় হবে। করদাতার টাকা আসবে কেবল তখন, যখন বিকল্প নেই এবং শর্ত স্পষ্ট। আর ছোট আমানতকারী থাকবেন সুরক্ষার সবচেয়ে ভেতরের বৃত্তে।

পাঁচটি দুর্বল শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক একীভূত করে গঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক এই ক্রমের পরীক্ষার ক্ষেত্র। পুরোনো শেয়ারের মূল্য শূন্য ঘোষণা করা ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত, কারণ এতে মালিকেরা ক্ষতির প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছেন। একইভাবে সঠিক ছিল সেপ্টেম্বরে সংসদে পাস হওয়া সংশোধনী, যার মাধ্যমে ব্যাংক রেজল্যুশন আইন ২০২৬-এর ১৮(ক) ধারা বাতিল হয়েছে। ওই ধারায় সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঢালার অর্থের মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ অগ্রিম দিয়ে পুরোনো মালিকদের ব্যাংক ফিরে পাওয়ার পথ খোলা ছিল।

কিন্তু আমানতকারীর প্রশ্নে নীতির দোলাচল আস্থার ক্ষতি করেছে। জানুয়ারিতে দুই বছরের মুনাফা কেটে নেওয়ার ঘোষণা, এক সপ্তাহের মধ্যে তা চার শতাংশে বেঁধে দেওয়া, তারপর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে কর্তনের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি প্রত্যাহার–প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে হয়তো যুক্তি ছিল, কিন্তু সব মিলিয়ে আমানতকারী পেয়েছেন অনিশ্চয়তার বার্তা। ব্যাংকটির নিজস্ব হিসাবে সেপ্টেম্বরের প্রথম ২০ দিনে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার গ্রাহক ৬ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা তোলার আবেদন করেছেন। গণমাধ্যমে খবর এসেছে, শাখাপর্যায়ে কাউকে কাউকে এককালীন মূল টাকা পেতে মুনাফার দাবি ছাড়তে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঘোষণা আর শাখার আচরণের এই ফারাক ঘোচানোই এখন প্রথম কাজ।

সরকারি অর্থের প্রশ্নেও স্বচ্ছতা দরকার, এবং সেজন্য দুটি ধারণার পার্থক্য বোঝা জরুরি। জরুরি তারল্য সহায়তা হলো সাময়িক ধার। ব্যাংকের হাতে নগদ নেই কিন্তু সম্পদ আছে, তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা দেয় এবং সেই টাকা ফেরত আসার কথা। গ্রাহকের টাকা ফেরত দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংককে যে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে, তা এই শ্রেণির সহায়তা। অন্যদিকে পুনঃমূলধনীকরণ হলো স্থায়ী ক্ষতিপূরণ–সম্পদের চেয়ে দায় বেশি হয়ে গেলে সেই গর্ত



ভরাট করা। প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার মূলধন নিয়ে নতুন ব্যাংকের যাত্রা এই দ্বিতীয় শ্রেণির, এবং শেষ বিচারে এর বোঝা জনগণের।

প্রথমটি অস্পষ্ট থাকলে আতঙ্ক বাড়ে; দ্বিতীয়টি শর্তহীন হলে নৈতিক বিপদ বাড়ে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের মালিকেরা ভাবতে শেখেন, ডুবলে রাষ্ট্র তো আছেই। তাই প্রতিটি টাকার বিপরীতে প্রকাশ্য শর্ত থাকা চাই: পেশাদার পর্ষদ, সময়সীমা বাঁধা পুনর্গঠন পরিকল্পনা, দায়ীদের সম্পদ উদ্ধারের অগ্রগতি এবং সংসদে নিয়মিত প্রতিবেদন।

আমানত সুরক্ষায় অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা

আমানত সুরক্ষায় অগ্রগতিও আছে, এবং তার স্বীকৃতি প্রাপ্য। এপ্রিলে পাস হওয়া আমানত সুরক্ষা আইন ২০২৬ প্রতি ব্যাংকে প্রতি আমানতকারীর সুরক্ষাসীমা এক লাখ থেকে দুই লাখ টাকায় উন্নীত করেছে এবং প্রথমবারের মতো ফাইন্যান্স কোম্পানির আমানতকারীদের আওতায় এনেছে। অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলনে নতুন সীমায় প্রায় ৯৩ শতাংশ হিসাব পুরোপুরি সুরক্ষিত। আইনে বলা আছে, অবসায়নের আদেশের পর লিকুইডেটর ১০ কর্মদিবসে আমানতকারীর তালিকা দেবেন, আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরের ৭ কর্মদিবসে সুরক্ষিত অর্থ পরিশোধ করবে।

তবু দুটি সীমাবদ্ধতা খোলাখুলি স্বীকার করা দরকার। এক, এই সুরক্ষা সক্রিয় হয় কেবল অবসায়ন বা আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তির পর। একটি ব্যাংক ধুঁকতে ধুঁকতে চালু থাকলে গ্রাহকের টাকা আটকে থাকলেও তহবিল কিছু করে না–সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকেরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। দুই, হিসাবের সংখ্যায় ৯৩ শতাংশ হলেও টাকার অঙ্কে আমানতের বড় অংশ সীমার বাইরে থাকে, কারণ বড় অঙ্কের অল্প কিছু হিসাবেই বেশিরভাগ আমানত জমা থাকে। অনেক অবসরপ্রাপ্ত মানুষের সারাজীবনের সঞ্চয়ও দুই লাখ টাকার বেশি।

এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ভারতের অভিজ্ঞতা শিক্ষণীয়। ২০২১ সালের সংশোধনীর পর সেখানে কোনো ব্যাংকের লেনদেনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা নিষেধাজ্ঞা দিলে, ব্যাংক অবসায়িত না হলেও, ৯০ দিনের মধ্যে আমানতকারী বিমাকৃত অর্থ পাওয়ার অধিকারী। বাংলাদেশেও রেজল্যুশনের আওতায় থাকা ব্যাংকের ছোট আমানতকারীদের জন্য এমন অন্তর্বর্তী পরিশোধ ব্যবস্থা আইনে যুক্ত করা উচিত।

আমানত একটি নৈতিক চুক্তি

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে আমানত শুধু ব্যাংকের হিসাবের নাম নয়, এটি এক গভীর নৈতিক দায়িত্ব। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দিতে, আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করবে' (সুরা আন-নিসা, ৪:৫৮)। একই আয়াতে আমানত ও আদল–বিশ্বস্ততা ও ন্যায়বিচার–পাশাপাশি এসেছে। ব্যাংক সংস্কারের নৈতিক মানদণ্ড এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলা কঠিন।

তবে স্পষ্ট করে বলতে চাই: ইসলামী পরিচয় সুশাসনের বিকল্প নয়। যে পাঁচটি ব্যাংক একীভূত করতে হয়েছে, সেগুলোর নামেও 'ইসলামী' শব্দ ছিল, শরিয়াহ বোর্ডও ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্যে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর সম্মিলিত মূলধন পরিস্থিতি প্রচলিত ব্যাংকের চেয়েও গভীর ঋণাত্মক।

নীতি বাস্তব রূপ পায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে: স্বাধীন বহিঃনিরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ঋণের কঠোর সীমা, পরিচালনা পর্ষদের প্রভাবমুক্ত শরিয়াহ তদারকি এবং সৎ আর্থিক প্রতিবেদন।

প্রচলিত ও ইসলামী–দুই ধারার ব্যাংকেরই প্রয়োজন একই মানের পেশাদার ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ।

মুনাফা কর্তনের পক্ষে একটি শরিয়াহ যুক্তি ছিল, এবং তা উড়িয়ে দেওয়া সৎ হবে না। মুদারাবা চুক্তিতে আমানতকারী মূলধনদাতা, ব্যাংক ব্যবস্থাপক বা মুদারিব। স্বাভাবিক ব্যবসায়িক ক্ষতি নীতিগতভাবে মূলধনদাতারাই বহন করেন। কিন্তু ফিকহের একই ঐতিহ্য বলে, মুদারিবের অবহেলা, চুক্তিভঙ্গ বা অসদাচরণে ক্ষতি হলে দায় মুদারিবের। যেখানে ক্ষতির উৎস পরিচালকদের অনিয়ম ও তদারকির ব্যর্থতা, সেখানে সেই ক্ষতি আমানতকারীর ঘাড়ে চাপানো ঝুঁকি ভাগাভাগি নয়, দায় হস্তান্তর।

তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা সমতাকরণ সঞ্চিতি ও বিনিয়োগ ঝুঁকি সঞ্চিতির নিয়ম এবং স্থিতি নিয়মিত প্রকাশ করা জরুরি, যাতে আমানতকারী আগেই জানেন কোন ঝুঁকি তাঁর, কোনটা নয়। শরিয়াহসম্মত আমানত সুরক্ষা নকশাও ভাবা দরকার। মালয়েশিয়া কাফালাহ বা ফিভিত্তিক জামিনদারির নীতিতে ইসলামী ব্যাংকের জন্য আলাদা আমানত সুরক্ষা তহবিল পরিচালনা করে। সহলেখক সাবাহর সঙ্গে আমার একটি গবেষণায় (ইকোনমিক্স লেটার্স, ২০১৯) আমরা কাফালাহভিত্তিক ইসলামী আমানত বিমার কাঠামো বিশ্লেষণ করেছিলাম; বাংলাদেশের নতুন আইনের অধীনে এমন একটি পৃথক শরিয়াহসম্মত জানালা বিবেচনার সময় এসেছে।

কোন ক্রমে এগোতে হবে?

সংস্কারকে তিনটি ধাপে সাজানো যায়।

প্রথম ধাপ: আস্থা ও নির্ভরযোগ্য তথ্য। সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকসহ সব রেজল্যুশনাধীন ব্যাংকে লিখিত ও একক উত্তোলন নীতি চাই, শাখায় শাখায় তার প্রয়োগ এবং প্রতি মাসে প্রকাশ্য হিসাব–কত আবেদন জমা পড়ল, কত পরিশোধ হলো, কত সময় লাগল। আমানত সুরক্ষা তহবিলের আকার ও সুরক্ষিত আমানতের অনুপাতও নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ: ক্ষতির স্বীকারোক্তি ও পুনর্গঠন। আগামী জানুয়ারি থেকে ১১টি ব্যাংকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পদের মান যাচাই শুরুর কথা। এর সারাংশ প্রকাশ করতে হবে, এবং সেই ফলের আগে কোনো একীভূতকরণের সিদ্ধান্ত নয়। সব ব্যাংকের জন্য এক সমাধানও নয়: কারও প্রয়োজন নতুন মূলধন, কারও সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূতকরণ, কারও সেতু ব্যাংকের মাধ্যমে পুনর্গঠন, আর কারও সুশৃঙ্খল প্রস্থান। প্রকৃত ক্ষতি না মেপে দুটি দুর্বল ব্যাংক জুড়ে দিলে একটি বড় দুর্বল ব্যাংকই তৈরি হয়।

একইসঙ্গে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পদ শনাক্ত ও উদ্ধার, প্রয়োজনে বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ ফেরাতে আন্তর্জাতিক আইনি সহায়তা নিতে হবে। নতুন আইনে ব্যক্তিগত দায়ের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান আছে, কিন্তু হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতির বিপরীতে তা প্রতীকী। আসল প্রতিকার সম্পদ উদ্ধারে।

তৃতীয় ধাপ: দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংস্কৃতি ও তদারকি। পরিচালকদের যোগ্যতা ও স্বাধীনতার কঠোর মানদণ্ড, সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঋণে কার্যকর সীমা এবং পুরো খাতজুড়ে একক ঋণগ্রহীতার মোট ঋণসীমা নির্ধারণ জরুরি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আইনও দীর্ঘদিন ঝুলে আছে; এপ্রিলে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ সংশোধন করে কেবল গভর্নরের বয়সসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা দিতে হবে প্রকাশ্য জবাবদিহির সঙ্গে–গভর্নর নিয়োগে স্বচ্ছ বাছাই এবং সংসদে নিয়মিত প্রতিবেদন। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী শিল্প ও অবকাঠামো অর্থায়নের ভার স্বল্পমেয়াদী আমানতের ওপর চাপিয়ে রাখা চলবে না। এ জন্য বন্ড, প্রকৃত সম্পদভিত্তিক সুকুক ও পুঁজিবাজারের বিকাশ জরুরি; নইলে আমানতকারীর টাকা বারবার দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির জামিন হয়ে থাকবে।

অগ্রগতি মাপার সূচকও আগে থেকেই ঠিক করা দরকার: উত্তোলনের আবেদন নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্পত্তির হার, ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের কাছ থেকে প্রকৃত আদায়, ন্যূনতম মূলধন পূরণকারী ব্যাংকের সংখ্যা এবং আমানত সুরক্ষা তহবিলের পর্যাপ্ততা। সম্পদের মান যাচাইয়ের পর খেলাপি ঋণের হার প্রথমে আরও বাড়তে পারে; তা ব্যর্থতা নয়, সত্য প্রকাশের মূল্য। কয়েকমাসে সব সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া অবাস্তব, কিন্তু প্রতি প্রান্তিকেও দৃশ্যমান অগ্রগতি দাবি করা ন্যায্য।

এই দাবি শুধু সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে নয়। সবল ব্যাংকগুলোর উচিত নিজেদের সুশাসনের তথ্য স্বেচ্ছায় প্রকাশ করে আস্থার মানদণ্ড উঁচু করা; ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর উচিত ইচ্ছাকৃত খেলাপি সদস্যদের আড়াল না করা; আর গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের দায়িত্ব এসব সূচক নিয়মিত সামনে আনা, যাতে সংস্কার কোনো এক সরকারের প্রকল্প হয়ে না থেকে জাতীয় অঙ্গীকারে পরিণত হয়।

সেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে ফিরে যাই। খেলাপি ঋণের দশমিক বিন্দুতে তাঁর আগ্রহ নেই, রেজল্যুশন আইনের ধারাও তিনি পড়বেন না। তিনি জানতে চান তিনটি জিনিস: নিজের টাকা প্রয়োজনের দিন পাবেন কি না, যাঁরা ব্যাংক ডুবিয়েছেন তাঁরা দায় নেবেন কি না, আর তাঁর নাতি-নাতনির জন্য এই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে কাজের সুযোগ তৈরি করবে কি না। এই তিন প্রশ্নের উত্তর যেদিন 'হ্যাঁ' হবে, সেদিনই বলা যাবে সংস্কার সফল হয়েছে। ব্যাংকের প্রকৃত মূলধন ভবন বা লাইসেন্স নয়; সাধারণ মানুষের আস্থা। সেই আস্থা ফিরিয়ে দেওয়াই আমানতের প্রকৃত প্রত্যর্পণ। ■

লেখক: ড. মোহাম্মদ কবির হাসান যুক্তরাষ্ট্রের এলএসইউ-নিউ অরলিন্সের অর্থনীতি ও অর্থায়ন বিভাগের ফিন্যান্সের অধ্যাপক ও মোফেট চেয়ার। তিনি সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নে ২০১৬ সালের আইএসডিবি পুরস্কারপ্রাপ্ত, এএওআইএফআই-এর এথিকস অ্যান্ড গভর্নেন্স বোর্ডের সদস্য এবং এর এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান।



মধ্যপন্থী উম্মাহর ঐক্য: নীতির ভিত্তি থেকে কার্যকর সনদের পথে

রোহিঙ্গা, ফিলিস্তিন ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার সংকট এবং মুসলিম বিশ্বের নৈতিক নেতৃত্বের সন্ধান



ড. মুহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

সার সংক্ষেপ: *মুসলিম বিশ্বের সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজন মধ্যপন্থা, ন্যায়বিচার ও প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্য। রোহিঙ্গা সংকট উম্মাহর মানবিক বিবেকের, ফিলিস্তিন প্রশ্ন ন্যায়বিচার ও অস্তিত্বের এবং আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্মিলিত সক্ষমতার পরীক্ষা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ধর্মীয় মতপার্থক্যকে বিভাজনের কারণ না বানিয়ে মৌলিক নীতি ও অভিন্ন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 'মিযান ফিকহ' বা ভারসাম্যভিত্তিক বিচারবোধের আলোকে ঐক্যের লক্ষ্য, নীতিগত ভিত্তি ও বাস্তবায়নপদ্ধতি নির্ধারণ জরুরি। বক্তার মতে, ঐক্যের সনদ হতে হবে কার্যকর অঙ্গীকার, যেখানে ন্যায়, মানবিক মর্যাদা, দায়িত্ব বণ্টন ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।*

ঐক্যের আহ্বান, বাস্তবতার মুখোমুখি

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সংকটের কেন্দ্রে একটি মৌলিক বৈপরীত্য কাজ করছে। ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও সভ্যতাগত উত্তরাধিকারে মুসলমানদের মধ্যে গভীর অভিন্নতা রয়েছে; অথচ রাজনৈতিক বিভাজন, মতাদর্শিক বিরোধ, ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস তাদের সম্মিলিত শক্তিকে বারবার দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে মুসলিম বিশ্বের সামনে আজকের প্রধান প্রশ্ন শুধু ঐক্য প্রতিষ্ঠার নয়; বরং কীসের ভিত্তিতে, কোন নীতিতে এবং কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সেই ঐক্যকে কার্যকর করা সম্ভব–সেটিই নির্ধারণ করা জরুরি।

'মধ্যপন্থী উম্মাহর ঐক্য–মূলনীতি থেকে ঐক্যের সনদ পর্যন্ত' শীর্ষক সম্মেলনের তাৎপর্য এখানেই। এটি কেবল মুসলিম বিশ্বের সংহতির পক্ষে একটি আবেগনির্ভর আহ্বান নয়; বরং ধর্মীয় নীতি, ন্যায়বিচার, মানবিক দায়িত্ব এবং সম্মিলিত রাজনৈতিক কর্মপন্থার মধ্যে একটি কার্যকর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

ঐক্য তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মানবিক দায়িত্বে প্রতিফলিত এবং বাস্তব কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। কেবল অভিন্ন পরিচয় কিংবা অভিন্ন স্লোগান কোনো জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন নৈতিক ঐকমত্য, পারস্পরিক আস্থা এবং মতপার্থক্য ব্যবস্থাপনার গ্রহণযোগ্য নীতি।

এই আলোচনার বৌদ্ধিক ভিত্তি নির্মাণে ইসলামী চিন্তাজগতে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যের যে ঐতিহ্য রয়েছে, তার গুরুত্ব অপরিসীম। ইত্তিহাদের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম শায়খ ইউসুফ আল-কারযাভী মধ্যপন্থার ধারণাকে সংকীর্ণ আপসের পরিবর্তে একটি বিস্তৃত, ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর চিন্তার এই তাৎপর্য আজও প্রাসঙ্গিক: মধ্যপন্থা হলো এমন এক বিচারবোধ, যা কোনো একটি দিকের অতিরঞ্জনে আটকে না থেকে সমগ্র বাস্তবতাকে ন্যায়সংগতভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের দুঃসময়ে ইত্তিহাদের সভাপতি শায়খ আলী মুহিউদ্দীন আল-কারাদাগীর সংহতি ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোও এই উপলব্ধির অংশ। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সময়ে সংহতির মূল্য শুধু তাৎক্ষণিক সহায়তায় সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি ভবিষ্যৎ সহযোগিতা ও পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিও নির্মাণ করে।

ঐক্যের কুরআনিক ভিত্তি: অভিন্ন বিশ্বাস থেকে অভিন্ন দায়িত্ব

পবিত্র কুরআনে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ধারণা কেবল পরিচয়গত অভিন্নতা হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, নৈতিক দায়িত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্কের শৃঙ্খলা। সূরা আল-আম্বিয়ার ৯২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মাহ একই উম্মাহ, আর আমিই তোমাদের রব; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।"

একইভাবে সূরা আশ-শূরার ১৩ নম্বর আয়াতে নবীদের প্রতি অর্পিত অভিন্ন দ্বীনি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ বিষয়ে বিভক্ত হওয়া যাবে না।

এই আয়াতগুলোর তাৎপর্য বর্তমান মুসলিম বিশ্বের জন্য গভীর। ঐক্য মানে মতপার্থক্যের সম্পূর্ণ বিলোপ নয়; বরং অভিন্ন মৌলিক নীতির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে মতপার্থক্যকে এমনভাবে পরিচালনা করা, যাতে তা বৃহত্তর নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বকে ধ্বংস না করে।

ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানচর্চা, ফিকহি ব্যাখ্যা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সুপরিচিত। কিন্তু এই বৈচিত্র্যকে যখন পারস্পরিক অবজ্ঞা, বিভাজন কিংবা শত্রুতার ভিত্তি বানানো হয়, তখন তা উম্মাহর সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতে, মতপার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়ে ন্যায়, সংলাপ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা গেলে বৈচিত্র্যই সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

অতএব, মধ্যপন্থী ঐক্যের প্রথম শর্ত হলো–বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তি ও নৈতিক দায়িত্বকে প্রাধান্য দেওয়া এবং গৌণ মতপার্থক্যকে বৃহত্তর সংহতির পথে বাধা হতে না দেওয়া।

রোহিঙ্গা: মুসলিম বিশ্বের নৈতিক বিবেকের পরীক্ষা

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কার্যকারিতা যাচাইয়ের প্রথম ক্ষেত্র মানবিক বিপর্যয়। বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গা সংকট এই বাস্তবতার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ উদাহরণ। মিয়ানমারে নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হয়ে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গার দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, স্থানীয় সমাজ, পরিবেশ ও নিরাপত্তাব্যবস্থার ওপর বহুমাত্রিক চাপ সৃষ্টি করেছে।

তবে সংকটটির তাৎপর্য কেবল বাংলাদেশের জাতীয় সক্ষমতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবিক দায়িত্ব, বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক সংহতিরও পরীক্ষা।

বাংলাদেশ আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে মানবিক দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু শরণার্থী ব্যবস্থাপনা কখনোই স্থায়ী সমাধানের বিকল্প হতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদি শিবিরজীবন, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, সীমিত শিক্ষার সুযোগ, জীবিকার সংকট এবং প্রত্যাবাসনের অনুপস্থিতি একটি প্রজন্মকে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে আটকে রাখতে পারে। একই সঙ্গে আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ বাড়লে সামাজিক উত্তেজনা ও নিরাপত্তাঝুঁকিও বৃদ্ধি পেতে পারে।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের নতুন সরকারের ঘোষিত অবস্থান–বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা থেকে তার অবসানের দিকে অগ্রসর হওয়া–একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত দিকনির্দেশনা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২০২৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে যে পাঁচ দফা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। তার মূল বিষয়গুলো হলো:

১. মিয়ানমারে নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন।

২. সহিংসতা বন্ধ এবং নাগরিকত্বসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।

৩. শরণার্থীদের জন্য টেকসই ও পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক মানবিক অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

৪. আন্তর্জাতিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

৫. মাদক, মানবপাচার ও আন্তসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা।

এই নীতিগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করবে বাস্তবায়নের ওপর। বিশেষত প্রত্যাবাসন হতে হবে নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিশ্চয়তার ভিত্তিতে। নাগরিকত্ব, চলাচলের স্বাধীনতা, জীবিকার সুযোগ ও নিরাপত্তার মতো মৌলিক প্রশ্নগুলোর সমাধান ছাড়া প্রত্যাবাসন টেকসই হবে না।

এখানে মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি স্পষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি কূটনৈতিক উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, ন্যায়বিচার এবং মিয়ানমারের ওপর কার্যকর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টিতে সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন। রোহিঙ্গাদের দুর্দশাকে কেবল বাংলাদেশের সমস্যা হিসেবে দেখার প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

রোহিঙ্গা সংকট তাই উম্মাহর বিবেকের পরীক্ষা। কারণ, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা তখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়, যখন তা দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার বাস্তব

কর্মসূচিতে রূপ নেয়।

ফিলিস্তিন: ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষা

ফিলিস্তিন প্রশ্ন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক সংহতি এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারের আরেকটি মৌলিক পরীক্ষা। বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অবস্থান হলো–১৯৬৭ সালের সীমারেখার ভিত্তিতে, পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

গাজায় বেসামরিক মানুষের মৃত্যু, ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি, অবকাঠামোর ধ্বংস এবং মানবিক সহায়তা নিয়ে সংকট আন্তর্জাতিক সমাজের সামনে গভীর নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, নিরাপদ ও বাধাহীন মানবিক সহায়তা প্রবেশ এবং বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধা কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করা, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা, মানবিক সহায়তা বাধাগ্রস্ত করা কিংবা আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে তার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী যথাযথ আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়ায় অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করাও জরুরি।

ফিলিস্তিনের প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থানকে তাই শুধু মুসলিম সংহতির প্রকাশ হিসেবে দেখলে এর পূর্ণ তাৎপর্য ধরা পড়বে না। এটি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভূখণ্ডের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আইন, দখলদারিত্বের অবসান এবং ন্যায়সংগত রাজনৈতিক সমাধানের বৃহত্তর নীতির সঙ্গেও যুক্ত।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা স্বীকার করতে হবে: রাজনৈতিক ঘোষণা নিজে থেকে যুদ্ধ থামাতে পারে না। প্রয়োজন সমন্বিত কূটনীতি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ভূমিকা, মানবিক সহায়তার নিশ্চয়তা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার চাপ।

এক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি করা যেতে পারে। তার মধ্যে থাকবে যুদ্ধবিরতির পক্ষে কূটনৈতিক উদ্যোগ, মানবিক সহায়তার অর্থায়ন, আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার প্রতি সমর্থন, ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ।

ফিলিস্তিনের প্রশ্ন উম্মাহর অস্তিত্বের পরীক্ষা–এই বক্তব্যের মূল তাৎপর্য হলো, মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক পরিচয় ও নৈতিক অবস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই। অন্যের অধিকার রক্ষার দাবি তখনই সর্বজনগ্রাহ্য হবে, যখন একই নীতি সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হবে।

মক্কা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা: সংহতির ভূরাজনৈতিক মাত্রা

মানবিক দায়িত্ব ও ন্যায়বিচারের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের সামনে নিরাপত্তা ও কৌশলগত সক্ষমতার প্রশ্নও রয়েছে। সমুদ্রপথ, জ্বালানি পরিবহন, বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা–এসব ক্ষেত্রের নিরাপত্তা আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে ২০২৬ সালের আগস্টে স্বাক্ষরিত বলে বক্তব্যে উল্লেখ করা মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রতি সমর্থনের বিষয়টি এই বৃহত্তর আলোচনার অংশ। তবে এ ধরনের চুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণ করতে হলে এর আনুষ্ঠানিক দলিল, সদস্যপদের শর্ত, পারস্পরিক প্রতিরক্ষা-অঙ্গীকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো এবং বাস্তবায়নব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বক্তব্যে চুক্তিটিকে কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোট হিসেবে নয়, বরং সম্মিলিত প্রতিরোধ, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। লোহিত সাগর, বাব আল-মান্দাব ও হরমুজ প্রণালির মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলপথের নিরাপত্তা বৈশ্বিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

এসব অঞ্চলে সংঘাত কিংবা নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে তার প্রভাব সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সীমানা অতিক্রম করে বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। জ্বালানি পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধি, সরবরাহব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর চাপ আমদানিনির্ভর অর্থনীতির জন্য বিশেষ ঝুঁকি তৈরি করে।

বাংলাদেশের মতো বাণিজ্য ও জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশের জন্য সামুদ্রিক নিরাপত্তা তাই দূরবর্তী ভূরাজনৈতিক বিষয় নয়; এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গেও যুক্ত। তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা চুক্তিতে অংশগ্রহণ বা আনুষ্ঠানিক সমর্থনের দাবি মূল্যায়ন করতে হলে সরকারের প্রকাশ্য অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট চুক্তির দলিল যাচাই করা অপরিহার্য।

মুসলিম দেশগুলোর প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কার্যকর হতে হলে তার ভিত্তি হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক আইন, সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বচ্ছতা এবং উত্তেজনা প্রশমনের অঙ্গীকার। সহযোগিতার উদ্দেশ্য যদি প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তাঝুঁকি কমানো হয়, তবে তা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে পারে। কিন্তু অস্পষ্ট অঙ্গীকার, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত মেরুকরণ কিংবা জবাবদিহিহীন সামরিক সিদ্ধান্ত নতুন সংকটও সৃষ্টি করতে পারে।

হারামাইন শরিফাইনের নিরাপত্তা মুসলমানদের কাছে গভীর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। একই সঙ্গে সেই নিরাপত্তা রক্ষার প্রচেষ্টা এমন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, যা বৃহত্তর আঞ্চলিক শান্তি, সংলাপ ও সংঘাত প্রতিরোধকে শক্তিশালী করে।

এখানেই ঐক্যের তৃতীয় পরীক্ষা। মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত শক্তি শুধু সামরিক সক্ষমতার পরিমাপে নির্ধারিত হবে না; বরং সেই শক্তি কতটা দায়িত্বশীলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সংঘাত প্রতিরোধে কতটা কার্যকর হচ্ছে এবং জনগণের নিরাপত্তা ও কল্যাণে কতটা অবদান রাখছে–তার ওপরও নির্ভর করবে।

‘মিযান ফিকহ’: মধ্যপন্থী ঐক্যের বৌদ্ধিক কাঠামো

রোহিঙ্গা, ফিলিস্তিন ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্নগুলো পরস্পর ভিন্ন হলেও এগুলোর মধ্যে একটি অভিন্ন বিষয় রয়েছে: নৈতিক অঙ্গীকারকে বাস্তব সিদ্ধান্তে রূপান্তর করার প্রয়োজন। এই সংযোগ ব্যাখ্যা করতে ‘মিযান ফিকহ’ বা ভারসাম্যভিত্তিক বিচারবোধ একটি কার্যকর ধারণাগত কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

‘মিযান’ অর্থ ভারসাম্য বা পরিমাপের মানদণ্ড। ইসলামী চিন্তায় ন্যায়সংগত বিচার, যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। আর ‘ফিকহ’ শুধু বিধান জানা নয়; বরং প্রাসঙ্গিক জ্ঞান, যুক্তি ও নীতির সাহায্যে বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করার একটি বৌদ্ধিক অনুশীলন।

এই আলোকে মধ্যপন্থী ঐক্যের ধারণাকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়: লক্ষ্য, সূচনা এবং প্রক্রিয়া।

১. লক্ষ্য: মধ্যপন্থার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ঐক্য

ঐক্য নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলেও তার প্রকৃতি নির্ধারণ করা অপরিহার্য। অন্যায়, আধিপত্য কিংবা জবরদস্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য দীর্ঘমেয়াদে ন্যায়সংগত হতে পারে না। একইভাবে এমন ঐক্যও টেকসই নয়, যেখানে মতপার্থক্যের কারণে পারস্পরিক সহযোগিতার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়।

মধ্যপন্থা এই দুই বিপরীত প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার একটি নৈতিক পদ্ধতি। এর উদ্দেশ্য সব পক্ষকে একই মতাদর্শে একীভূত করা নয়; বরং মৌলিক নীতিতে ঐকমত্য তৈরি করে মতপার্থক্যের সীমা ও ব্যবস্থাপনার নিয়ম নির্ধারণ করা।

ইসলামী আইনচিন্তায় ইমাম আবু ইসহাক আল-শাতিবির মাকাসিদুশ শরিয়াহ বা শরিয়াহর উদ্দেশ্যসংক্রান্ত আলোচনা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। জীবন, ধর্ম, বিবেক, পরিবার ও সম্পদের সুরক্ষার মতো মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো বিচার ও নীতিনির্ধারণে অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের জীবন রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ানো এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা নিছক রাজনৈতিক সুবিধার প্রশ্ন নয়; এগুলো নৈতিক দায়িত্বের অংশ।

মধ্যপন্থী ঐক্য তাই আত্মসমর্পণ নয়, আবার মতাদর্শিক একরূপতাও নয়। এটি এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ন্যায়বিচার এবং অভিন্ন দায়িত্বকে বিভাজনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়।

২. সূচনা: মৌলিক নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া

ঐক্যের যাত্রা কোথা থেকে শুরু হবে? এর উত্তর হলো–মৌলিক নৈতিক ও ধর্মীয় নীতিকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে।

মুসলিম বিশ্বের বহু বিভাজন এমন সব বিষয়ে সংঘটিত হয়, যেগুলোতে মতপার্থক্যের ঐতিহাসিক বা বৌদ্ধিক ভিত্তি থাকতে পারে; কিন্তু সেসব মতপার্থক্যকে যখন মানুষের জীবন, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বের ওপর স্থান দেওয়া হয়, তখন অগ্রাধিকারের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

এখানে কাতঈ ও যন্নি, কুল্লি ও জুযই–ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের এই পার্থক্যগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। কাতঈ বলতে যে বিষয়ে প্রমাণ ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট, আর যন্নি বলতে যে বিষয়ে ব্যাখ্যা বা প্রমাণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে, তা বোঝানো হয়। একইভাবে কুল্লি হলো সামগ্রিক নীতি এবং জুযই হলো তার বিশেষ বা আংশিক প্রয়োগ।

এসব ধারণাকে যান্ত্রিক সূত্রে পরিণত না করে প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী প্রয়োগ করা জরুরি। তবে মৌলিক নৈতিক নীতি ও সুস্পষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে গৌণ ব্যাখ্যাগত বিরোধের সংঘাত ঘটলে অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ফিকহি মতপার্থক্য থাকতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতি কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কৌশল নিয়েও মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু এসব পার্থক্য যেন মানবিক বিপর্যয়ের মুখে সহযোগিতা, বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা কিংবা ন্যায়বিচারের পক্ষে সম্মিলিত উদ্যোগকে অকার্যকর না করে, সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ভারসাম্যভিত্তিক বিচারবোধের মূল শিক্ষা হলো–সব বিষয় সমান গুরুত্বের নয় এবং সব মতপার্থক্য একই মাত্রার নয়। অগ্রাধিকারের যথাযথ বিন্যাসই কার্যকর ঐক্যের ভিত্তি নির্মাণ করে।

৩. প্রক্রিয়া: ঘোষণার পরিবর্তে কার্যকর ঐক্যের সনদ

ঐক্যের আহ্বানকে স্থায়ী করতে হলে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। এ কারণেই একটি ঐক্যের সনদের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ।

এ ধরনের সনদ কেবল সম্মেলনের সমাপনী ঘোষণা কিংবা রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিবৃতি হওয়া উচিত নয়। বরং এতে থাকতে হবে অভিন্ন নীতির সংজ্ঞা, সহযোগিতার ক্ষেত্র, দায়িত্ব বণ্টন, বাস্তবায়নের সময়সীমা, অগ্রগতি মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং মতবিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।

মদিনার সনদ ইতিহাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিধান নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের জন্য এর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া সম্ভব; তবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আইন এবং বহুপক্ষীয় সম্পর্কের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে নতুন কাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

একটি কার্যকর ঐক্যের সনদে অন্তত তিনটি মানদণ্ড অপরিহার্য।

প্রথমত, কথা ও কাজের সামঞ্জস্য। পবিত্র কুরআনের সূরা আস-সাফের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ যা করে না, তা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে তা অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এই নৈতিক নির্দেশনা রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানবিক সংহতির ঘোষণা দিয়ে বাস্তবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া ঐক্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে।

দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সূরা আর-রহমানের সপ্তম থেকে নবম আয়াতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং পরিমাপে ন্যায় রক্ষার নির্দেশনা রয়েছে। আধুনিক রাজনৈতিক ভাষায় এর অর্থ হতে পারে–সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা, দায়িত্বের ন্যায্য বণ্টন,

আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা এবং দুর্বল পক্ষের অধিকার রক্ষা।

তৃতীয়ত, রহমত ও মানবিক মর্যাদার মানদণ্ড। পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। এই নৈতিক আদর্শের আলোকে ঐক্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা; নিছক শক্তির প্রদর্শন নয়।

এসব নীতি বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত পরামর্শ, যৌথ মানবিক তহবিল, সংকটকালীন সমন্বয়ব্যবস্থা, কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অগ্রগতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে।

অর্থাৎ, ওয়াজ থেকে দায়িত্বে, ঘোষণাপত্র থেকে কর্মপরিকল্পনায় এবং ব্যক্তিগত সদিচ্ছা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতে উত্তরণের মধ্য দিয়েই ঐক্যের সনদ কার্যকর হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ও মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করতে পারে। দেশটি একদিকে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার মানবিক দায়িত্ব বহন করছে; অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার প্রশ্নে জনগণের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা এবং আইনের শাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনকে স্থায়ী অগ্রগতিতে রূপ দিতে হলে নির্বাচনী বৈধতার পাশাপাশি নাগরিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং জবাবদিহিমূলক প্রশাসন নিশ্চিত করতে হয়।

একইভাবে মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর সংহতির জন্যও রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি কার্যকর প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে কেবল নেতৃত্বের ব্যক্তিগত সমঝোতার ওপর নির্ভরশীল রাখলে তা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল হয় না। নিয়মিত সংলাপ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তই সহযোগিতাকে টেকসই করতে পারে।

বাংলাদেশের জন্যও এ ধরনের সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র রয়েছে–মানবিক সহায়তা, শ্রমবাজার, শিক্ষা ও গবেষণা, প্রযুক্তি, খাদ্যনিরাপত্তা, জ্বালানি, বাণিজ্য এবং সমুদ্রপথের নিরাপত্তা। এসব ক্ষেত্রে বাস্তব ফল অর্জন করা গেলে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সাধারণ মানুষের জীবনে দৃশ্যমান সুফল বয়ে আনতে পারে।

তবে ঐক্যকে কার্যকর করার পথে সীমাবদ্ধতাগুলোও অস্বীকার করা যাবে না। মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, নিরাপত্তাগত অগ্রাধিকার এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্য দূর করা সহজ নয়। তাই সব বিষয়ে একমত হওয়ার অপেক্ষায় না থেকে যেসব বিষয়ে বাস্তব সহযোগিতা সম্ভব, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তা ও প্রত্যাবাসনের কূটনীতি, ফিলিস্তিন প্রশ্নে বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক আইনভিত্তিক সহযোগিতা–এই তিনটি ক্ষেত্র যৌথ কর্মসূচির পরীক্ষামূলক ভিত্তি হতে পারে।

ঐক্য একটি নৈতিক অঙ্গীকার, প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বও

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সংকট আমাদের সামনে একটি মৌলিক সত্য তুলে ধরেছে: অভিন্ন ধর্মীয় পরিচয় নিজে থেকেই রাজনৈতিক ঐক্য নিশ্চিত করে না। ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অভিন্ন নৈতিক নীতি, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, পারস্পরিক আস্থা এবং সহযোগিতার কার্যকর প্রতিষ্ঠান।

রোহিঙ্গা সংকট আমাদের শেখায়, মানবিক সংহতি তখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়, যখন দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের প্রশ্ন মনে করিয়ে দেয়, ন্যায়বিচারের পক্ষে অবস্থান নিতে হলে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবিক মর্যাদার নীতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হয়। আর আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখায়, সম্মিলিত শক্তি তখনই কল্যাণকর হয়, যখন তা সংঘাত বাড়ানোর পরিবর্তে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

এই তিনটি পরীক্ষার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে ভারসাম্যভিত্তিক বিচারবোধ–যেখানে মৌলিক নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, মতপার্থক্যকে দায়িত্বশীলভাবে পরিচালনা করা হবে এবং ঘোষিত অঙ্গীকারকে বাস্তব কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হবে।

এ কারণেই মধ্যপন্থী ঐক্যের একটি সনদ কেবল প্রতীকী দলিল হতে পারে না। এতে থাকতে হবে নৈতিক অঙ্গীকার, বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য, দায়িত্ব বণ্টন এবং জবাবদিহির সুস্পষ্ট কাঠামো। সনদের মূল্য নির্ধারিত হবে তার ভাষার সৌন্দর্যে নয়, বরং তা কত মানুষের জীবন রক্ষা করে, কতটা অন্যায় প্রতিরোধ করে এবং কতখানি পারস্পরিক আস্থা নির্মাণ করে–তার ভিত্তিতে।

আমাদের সামনে তাই দ্বৈত দায়িত্ব রয়েছে: একদিকে উম্মাহর ঐক্যের নৈতিক ভিত্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা, অন্যদিকে সেই ঐক্যকে কার্যকর করার প্রাতিষ্ঠানিক পথ নির্মাণ করা। প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি লক্ষ্যহীন হয়ে পড়বে; দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটি আবেগ ও ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

মধ্যপন্থী ঐক্যের প্রকৃত অর্থ হলো ন্যায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া, মানবিক দায়িত্বকে সম্মিলিতভাবে বহন করা এবং মতপার্থক্যের মধ্যেও সহযোগিতার পথ খোলা রাখা। এই নীতির ভিত্তিতে একটি কার্যকর সনদ নির্মাণ করা গেলে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য কেবল অতীতের গৌরবের স্মারক থাকবে না; বরং ভবিষ্যতের শান্তি, ন্যায়বিচার ও সম্মিলিত অগ্রগতির বাস্তব কর্মসূচিতে পরিণত হতে পারে।

সুতরাং, মধ্যপন্থী ঐক্যের সনদ প্রণয়ন শুধু একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ নয়; এটি নৈতিক দায়িত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার একটি অপরিহার্য প্রয়াস। ■



ধর্মীয় প্রতীক অবমাননা: আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন

ড. আল-মাহজুব বিন সাইদ
রাবাত, মরক্কো

- ধর্মীয় বিদ্বেষ বা বৈষম্য নতুন কোনো ঘটনা নয়; তবে ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর এটি ব্যাপক ও তীব্র রূপ লাভ করে।
- মানবাধিকারের সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা–বিশেষ করে ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। এ দুইয়ের সুরক্ষায় সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন না করা পর্যন্ত এই ভারসাম্য অর্জন সম্ভব নয়।
- মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ (MWL) জোর দিয়ে বলেছে, 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা' নামক মানবাধিকার নীতিটিকে অবশ্যই মানবীয় মূল্যের কাঠামোয় পরিচালিত হতে হবে, যার মূল ভিত্তি হবে অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা।

ধর্মের প্রতি অবমাননার ঘটনা নতুন কোনো বিষয় নয়; বরং এর শিকড় ইতিহাসের গভীরে প্রথিত। তাই ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমা সম্পর্কের নানা ঘটনার আলোকেই কেবল এটিকে দেখা বস্তুনিষ্ঠ হবে না।

ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ দীর্ঘকাল ধরে চলে আসলেও ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর তা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। সে সময় ছাপাখানার প্রসারের পাশাপাশি সাহিত্যকর্ম এবং পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই অবমাননার পরিধি আরও গভীর হয়।

ধর্মীয় অবমাননার বিষয়টি গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাকে ভাবিয়ে তুলছে। এর সঙ্গে জড়িতদের নিন্দা জানিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও, সেগুলোর নৈতিক প্রভাব থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত তা আইনিভাবে বাধ্যতামূলক নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং মানবাধিকার কাউন্সিলে ধর্মীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে ধর্মের গুরুত্ব এবং

জাতিসংঘে এর অবস্থান নিয়ে প্রধানত তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়:

- প্রথম ধারা: আন্তর্জাতিক আইনে ধর্মের কোনো আদর্শিক বা নীতিগত ভূমিকা থাকা উচিত নয়। বেশিরভাগ পশ্চিমা আইনবিদ এই অবস্থান সমর্থন করেন। তাঁদের যুক্তি হলো, আন্তর্জাতিক আইনকে অবশ্যই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে।
- দ্বিতীয় ধারা: জনপরিসরে ধর্মের বড় কোনো ভূমিকার দাবি না তুলে আন্তর্জাতিক আইনে ধর্মীয় উপাদানের প্রকৃত ও মৌলিক ভূমিকা স্বীকার করে। এই ধারার মতে, আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- তৃতীয় ধারা: ধর্মকে কেবল একটি উৎস হিসেবে নয়, বরং একটি মানদণ্ড হিসেবেও আন্তর্জাতিক আইনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা উচিত বলে মনে করে। এটিকে একটি 'সমঝোতামূলক ধারা' হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনে ধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মনে করা একদল আইনবিদ এটি সমর্থন করেন।

দেখা যায় যে, মধ্যপন্থা অবলম্বনে সচেষ্ট জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় এই তৃতীয় ধারাটিরই প্রাধান্য রয়েছে। সংস্থাগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতীককে অবমাননা বা অপমান করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার পক্ষে তুলনামূলক জোরালো অবস্থান নিয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক দলিলগুলোতে ধর্মের অবমাননা ও অপমান এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের উসকানির মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রাখা হয়েছে।

ব্যঙ্গচিত্রসহ সব ধরনের অবাধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আড়ালে ধর্ম অবমাননা রোধের দাবি ঘিরে তীব্র বিতর্ক ও কঠোর সমালোচনা তৈরি হয়েছে। এর ফলে একটি শক্তিশালী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা 'প্রেসার গ্রুপ' গড়ে উঠেছে, যা ধর্মকে সমালোচনা, অপমান ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য থেকে রক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের পাশাপাশি জাতীয় আইন প্রণয়নের তাগিদ দিচ্ছে। বর্ণ ও ধর্মীয় বিদ্বেষজনিত অপরাধ হ্রাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মূলত এই উদ্যোগগুলো তাদের বৈধতা খুঁজে পায়। এর মূল লক্ষ্য মানবাধিকারের চর্চাকে সীমিত করা নয়, বরং এক পক্ষের অবমাননার মাত্রা কমিয়ে আনা।

মানবাধিকারের সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা–বিশেষ করে ধর্মীয় স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত কঠিন এবং সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন না করা পর্যন্ত তা অর্জন করা অসম্ভব। অন্যথায়, মতপ্রকাশের নামে নৈরাজ্য এবং প্রচারমাধ্যমের একচ্ছত্র আধিপত্যের ফলে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকার মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হবে।

২০০৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে 'ধর্মীয় অবমাননা'র ধারণা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। বিশেষ করে, ডেনমার্ক ও ফ্রান্সের কিছু পত্রিকায় মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে অবমাননাকর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের পর এই বিতর্ক চরমে পৌঁছায়। সে সময় বর্ণবৈষম্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদকের পেশ করা এক প্রতিবেদনে 'ধর্মকে অপমান' ধারণার পরিবর্তে 'বিদ্বেষ ছড়ানো' ধারণাটি স্থলাভিষিক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। পরিষদের সদস্যরা তখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন–একদল ধর্ম রক্ষায় কঠোর আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, আর অন্যদল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

পরবর্তীকালে ২০১১ সালের ১১ এপ্রিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৬৫/২২৪ নম্বর প্রস্তাব অনুমোদন করে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়া পর্যন্ত প্রণীত নানা আন্তর্জাতিক চুক্তি, ঘোষণাপত্র এবং বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো এতে পর্যালোচনা করা হয়–বিশেষ করে ধর্মীয় বৈষম্য, সর্বাগ্রে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষয়টি এতে গুরুত্ব পায়।

এই প্রস্তাবের নবম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ছাপাখানা, অডিও-ভিজ্যুয়াল ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে সহিংসতা ও বর্ণবিদ্বেষ উসকে দেওয়া, যেকোনো ধর্মের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য সৃষ্টি করা কিংবা পবিত্র গ্রন্থ, উপাসনালয় ও ধর্মীয় প্রতীককে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ঘটনায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করছে। প্রস্তাবটিতে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ কমিটির গৃহীত ১৫ নম্বর সাধারণ সুপারিশও পুনর্ব্যক্ত করা হয়; যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে সংগতি রেখে এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের উসকানি এড়াতে বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্ব বা বর্ণবিদ্বেষমূলক সমস্ত চিন্তাভাবনা প্রকাশ নিষিদ্ধ করার বিধান দেয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ সব রাষ্ট্রকে ধর্ম বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণার বিধান বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের নিজ নিজ আইনি ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ধর্ম ও এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার ফলে সৃষ্ট সব ধরনের বিদ্বেষ, বৈষম্য, হুমকি ও নিপীড়ন থেকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়।

জাতিসংঘের কিছু সদস্য রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করে ধর্মকে অপমান করা এবং অনুসারীদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের চর্চা বন্ধে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তা সত্ত্বেও, মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অজুহাতে এখনো কিছু পশ্চিমা দেশে এই ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের নিয়ম মেনে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্মের পবিত্রতা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি প্রদানে এসব দেশ জাতীয় আইন প্রণয়নে এখনও অনিচ্ছুক।

এসব বাস্তবতার আলোকে বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে আসে। কীভাবে ধর্ম অবমাননা রোধ করা সম্ভব? জাতিসংঘের

প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের কার্যকর কৌশলগুলো কী কী? যেসব আইন এটি প্রতিরোধ করে, সেগুলোর সুফল কি দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে? অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও সাব-সাহারা আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে চরমপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিস্তার আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে এবং ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামভীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে–এমন পরিস্থিতিতে বিষয়টি কি আগের মতোই উপেক্ষিত থাকবে? ইউরোপে যখন জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য, বিদ্বেষ ও বর্ণবাদের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন ধর্মকে সম্মান জানানো এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমানা নির্ধারণ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারে একটি বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নের সময় কি হয়নি?



মূল প্রশ্ন থেকেই যায়: এটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব? সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, নাকি এটিকে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছেড়ে দিয়ে, অথবা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সমান্তরালে স্থান দিয়ে? একটির ওপর অন্যটির অযাচিত আধিপত্য মানবাধিকার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত দুটি মৌলিক নীতিরই লঙ্ঘন ঘটাতে পারে; যার একটিকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যটিকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। এসব বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বস্তুনিষ্ঠ ও সামগ্রিক সমাধানে পৌঁছানো নিঃসন্দেহে ধর্মীয় অনুসারীদের মধ্যে সংলাপ ও পারস্পরিক সহাবস্থান বাড়াতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে–যা ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার পথ বেছে নেওয়া এবং বৈশ্বিক শান্তিকে হুমকির মুখে ফেলা অপতৎপরতাগুলো মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।

মুসলিম উম্মাহর প্রধান সংগঠন হিসেবে 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ' (MWL) এই দায়িত্ব পালনে অন্যতম যোগ্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা। সংস্থাটির 'মক্কা ঘোষণা'য় জোরালোভাবে বলা হয়েছে, 'বিদ্বেষ বিস্তারকারী এবং সহিংসতা, সন্ত্রাসবাদ ও সভ্যতাগত সংঘাতের উসকানদাতাদের প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করাই ধর্মীয় ও জাতিগত সংঘাতের মূল কারণগুলো নির্মূল করার জন্য যথেষ্ট।'

আমাদের দৃষ্টিতে, এই মিশনে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের যোগ্যতার বিষয়টি দুটি মৌলিক বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথমত: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের মহাসচিব শেখ ড. মুহাম্মদ বিন আবদুল করিম আল-ইসার নিরলস প্রচেষ্টা, যা তিনি বিশ্বজুড়ে কল্যাণ, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রসারে চালিয়ে যাচ্ছেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে সংলাপ জোরদার করা, ইসলামের উদার ও মহান মূল্যবোধকে মানবিক ও সভ্যতার মেনিফেস্টোতে রূপান্তর করা এবং ভালোবাসা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে 'একক মানব পরিবার' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির সম্প্রীতি বিনষ্টকারী যেকোনো অবমাননার বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছেন এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও যৌথ মূলবোধের ভিত্তিতে যোগাযোগের আহ্বান জানাচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত: সংস্থাটির মূল লক্ষ্য হলো সংঘাত ও মতভেদের কারণগুলো দূর করা, মানবজাতি ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংহতি জোরদার করা এবং সংলাপের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রভাগে স্থান করে নিয়েছে; কারণ এটি ইসলামী পরিচয়ের স্বকীয়তা বজায় রেখে বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও চরমপন্থা পরাস্ত করতে এটি ওআইসি (OIC), আইসেস্কো (ICESCO), ইউনেস্কো (UNESCO), 'ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ রিলিজিয়াস লিডার্স', 'পন্টিফিকাল কাউন্সিল ফর ইন্টেররিলিজিয়াস ডায়ালগ' এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'কল অফ কনসায়েন্স ফাউন্ডেশন'-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

পরিশেষে, ২০২০ সালের অক্টোবরে ফ্রান্সের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ একটি জোরালো বিবৃতি জারি করে যেকোনো ধর্মের 'ধর্মীয় প্রতীক' ও অনুসারীদের অবমাননার তীব্র নিন্দা জানায় এবং স্পষ্ট করে যে ইসলাম কখনোই তা অনুমোদন করে না। MWL পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা' নামক মানবাধিকার নীতিটিকে অবশ্যই অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানবিক মূল্যবোধের আলোকেই মূল্যায়ন করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যখন সেই নৈতিক ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তা স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থকে ক্ষুণ্ন করে এবং আইনগত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। সুতরাং, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অজুহাতে বিদ্বেষ ও বর্ণবাদ উসকে দেওয়া কিংবা জাতি ও মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার সংঘাত তৈরি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ■



ইসরাইলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আরব রাজনৈতিক সদিচ্ছার সংকট

আরব ভূখণ্ড নিজস্ব শক্তির উৎস থেকে ক্রমেই বিদেশি প্রভাব বিস্তারের উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে।



মোহাম্মদ আবু আজুর
লেখক ও প্রকাশক, মিশর

সারসংক্ষেপ: *কৌশলগতভাবে সৌদি আরবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যুদ্ধের অবসান ঘটানো, একটি কার্যকর ইয়েমেনি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং নিরাপত্তা হুমকিকে কাজে লাগিয়ে নির্ভরশীলতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আব্রাহাম অ্যাকর্ডস আরও গভীর একটি প্রশ্ন সামনে এনেছে–সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগ কি এমন একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে ইসরাইল নিরাপত্তা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে?*

ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তিতে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর গোপন রাখছে না। তবে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অঞ্চলটির রাজধানীগুলো দখল করা কিংবা প্রতিপক্ষের সব বাহিনীকে পরাজিত করাই তার একমাত্র পথ নয়; বরং ক্ষমতার ভারসাম্য, কৌশলগত যোগাযোগপথ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চায়।

বর্তমানে আমরা যা দেখছি, তা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যার পরিণতি এখন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শান্তিচুক্তি থেকে শুরু করে ইরাকের ধ্বংসযজ্ঞ, সিরিয়ায় আসাদ পরিবারের দীর্ঘ শাসন ও শেষ পর্যন্ত তার পতন, লিবিয়া, সুদান ও ইয়েমেনের বিভক্তি এবং সর্বশেষ আব্রাহাম অ্যাকর্ডস–সব মিলিয়ে অঞ্চলটি ধারাবাহিকভাবে তার ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো হারিয়েছে। বিপরীতে, নিজেদের স্বার্থ অন্যদের ওপর

চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসরাইলের সুযোগ বেড়েছে।

এসব সংকটের সবগুলো ইসরাইলকে নিজ হাতে তৈরি করতে হয়নি। তার প্রয়োজন হয়েছে বিদ্যমান সংকটগুলোকে কাজে লাগানো এবং সেগুলোর পরিণতিকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের অনুকূলে পরিচালিত করা। পুরো অঞ্চল দখল করার প্রয়োজন নেই, যদি অঞ্চলটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করা যায়, তার শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া যায় এবং এখানকার নিরাপত্তাব্যবস্থাকে ইসরাইলি স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

কৌশলগত পথঃ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি

ইসরাইলের তৎপরতার মানচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই দ্বন্দ্ব আর শুধু ফিলিস্তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন লোহিত সাগর, বাব আল-মান্দেব প্রণালি, এডেন উপসাগর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। সোমালিল্যান্ডের সঙ্গে ইসরাইলের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক, হর্ন অব আফ্রিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রভাবের সঙ্গে তার স্বার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইয়েমেন ও সুদানের ঘটনাপ্রবাহ–সবকিছুই ইসরাইলি হিসাব-নিকাশে বন্দর, দ্বীপ ও সামুদ্রিক যোগাযোগপথের গুরুত্ব তুলে ধরে।

এখানেই ইসরাইলি ও মার্কিন স্বার্থের মিল দেখা যায়। বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহনের পথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এমন প্রভাব অর্জন করা সম্ভব, যা সামরিক শক্তির প্রচলিত সীমাকেও ছাড়িয়ে যায়।

বিপদের বিষয় হলো, এসব কৌশলগত অবস্থানের অধিকারী আরব দেশগুলো এখন যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ বিভাজনে জড়িয়ে পড়েছে অথবা বহিরাগত শক্তির নিরাপত্তা-সহায়তার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। ফলে আরব ভূখণ্ড নিজস্ব জনগণের শক্তির উৎস না হয়ে বিদেশি প্রভাব বিস্তারের এক উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে।

সৌদি আরবঃ ক্লান্তি ও জোটের ফাঁদ

সৌদি আরব ও হুতিদের মধ্যকার পরিস্থিতি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। হুতিদের হামলা সৌদি আরবের নিরাপত্তাকে ক্রমাগত চাপে রাখছে এবং দেশটির বিভিন্ন স্থাপনা ও অর্থনীতির জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, ইসরাইল এই হুমকিকে কাজে লাগিয়ে সৌদি আরবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম এক অংশীদার হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। ইসরাইলি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে সৌদি আরবের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের প্রস্তাব এবং হুতিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলি সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়: সৌদি আরবের নিরাপত্তার জন্য সৃষ্ট এই হুমকিকে কি এমন একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তাব্যবস্থায় দেশটিকে যুক্ত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে, যেখানে ইসরাইলও অন্তর্ভুক্ত থাকবে? আর সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কি ফিলিস্তিন ইস্যুকে আড়ালে সরিয়ে রেখে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পথ প্রশস্ত করা হবে?

ইয়েমেনের সংঘাতে জড়িয়ে সৌদি আরবের শক্তি ও সম্পদ ক্ষয় হওয়া দেশটির স্বার্থের অনুকূল নয়। সৌদি আরব জোটবদ্ধভাবে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে সৌদি আরবের সমর্থনে মিশরের এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ারও জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইয়েমেনকে একটি স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে দেওয়াও আরব কিংবা মুসলিম বিশ্বের স্বার্থের অনুকূল নয়।

এ পরিস্থিতিতে কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো–সৌদি আরবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যুদ্ধের অবসান ঘটানো, একটি কার্যকর ইয়েমেনি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং নিরাপত্তা হুমকিকে কাজে লাগিয়ে কোনো পক্ষের ওপর নির্ভরশীলতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করা।

রাজনৈতিক সদিচ্ছার সংকট

সমস্যাটি শুধু ইসরাইলের শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর একটি বড় অংশ আরব রাজনৈতিক সদিচ্ছার দুর্বলতার মধ্যেও নিহিত। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে মরক্কো, মিশর থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ সংকটে বিপর্যস্ত দেশগুলো–ইসরাইলের সঙ্গে এসব দেশের সম্পর্কের ধরন এক নয়। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, আঞ্চলিক স্বার্থ ও জোটের সমীকরণে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে ইসরাইলের সক্ষমতা ক্রমেই বাড়ছে।

আব্রাহাম অ্যাকর্ডসকে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি আরও গভীর একটি প্রশ্ন সামনে এনেছে: সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ কি এমন একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে নিরাপত্তা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসরাইল প্রধান ভূমিকা পালন করবে?

কেমন সেই শান্তি, যা দখলদারিত্ব, অবৈধ বসতি সম্প্রসারণ ও আগ্রাসন অব্যাহত রাখার সুযোগ দেয়? কেমন সেই স্থিতিশীলতা, যা ফিলিস্তিনিদের অধিকার অস্বীকার করা কিংবা সিরিয়ার ভূখণ্ডে জোরপূর্বক প্রবেশের ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকে?

আমাদের জনগণের সামনে থাকা গুরুতর সমস্যাগুলোর একটি হলো, কিছু সরকারের টিকে থাকার বিষয়টি বিদ্যমান ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া এসব সরকারের কাছে এমন এক বোঝায় পরিণত হয়েছে, যার মূল্য দিতে তারা ভয় পায়।

ইসরাইল নৈতিক লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ছে

এই অন্ধকার পরিস্থিতির মধ্যেও আরেকটি পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে, যার প্রভাব সামরিক জোটের চেয়েও গভীর হতে পারে। গাজা থেকে আসা দৃশ্য ও ঘটনাবলির মধ্য

দিয়ে একটি নতুন প্রজন্ম বিশ্বকে দেখার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলছে। তারা দখলদারিত্বের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করছে এবং স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পক্ষে পশ্চিমা দেশগুলোর ঘোষিত অঙ্গীকারের সঙ্গে ফিলিস্তিন প্রশ্নে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের ব্যবধান স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছে।

ইসরাইলের বক্তব্য ও বয়ান এখন আর আগের মতো সমালোচনা থেকে সুরক্ষা পাচ্ছে না। পূর্ব ও পশ্চিম–উভয় বিশ্বের তরুণেরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও রাজপথে নেমে এসেছে। তারা দখলদারিত্ব ও অবৈধ বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করছে এবং ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি দাবি করছে।

এখানেই বড় বৈপরীত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসরাইল তার ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়াচ্ছে, অথচ একই সময়ে জনমত, নৈতিক অবস্থান ও বৈধতার প্রশ্নে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এই লড়াইয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো দখলদারিত্ব, অবিচার ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান।

ঐশ্বরিক বিধান ও নবায়ন

ইতিহাস কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে গড়ে ওঠে না। একইভাবে, ক্ষমতার ভারসাম্যও চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "আর এসব দিনকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তিত করি।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪০)

এবং অন্যত্র বলা হয়েছে– "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।" (সূরা আর-রাদ, ১৩:১১)

আল্লাহর বিধানের অন্যতম শিক্ষা হলো, দুঃখ-কষ্ট মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে পারে। দুর্ভোগ এমন একটি প্রজন্মের জন্ম দিতে পারে, যারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে আরও গভীর উপলব্ধি অর্জন করে। তবে শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করা কিংবা নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে বিজয়ের নিশ্চয়তা আসে না। এর জন্য প্রয়োজন ঈমান, জ্ঞান, কর্ম, প্রস্তুতি ও ধৈর্য।

বর্তমান ঘটনাবলি এমন একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে ওঠার ভিত্তি তৈরি করতে পারে, যারা তাদের নেতাদের অসহায়ত্বকে উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করবে না, স্বৈরাচার মেনে নেবে না এবং প্রতিরোধকে শুধু সামরিক সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে না। বরং তারা জ্ঞান, সংগঠন এবং জনপরিসর, রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইনি পদক্ষেপের সমন্বয়ে পরিবর্তন ও নবায়নের একটি বিস্তৃত আন্দোলন গড়ে তুলবে।

এমন একটি প্রজন্ম ফিলিস্তিনকে সমর্থন করা এবং মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস করার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে। তারা সাহসিকতা ও দায়িত্বহীনতার পার্থক্য উপলব্ধি করবে এবং কার্যকর প্রতিরোধ ও পরিণতি বিবেচনা না করে শুধু স্লোগান দেওয়ার মধ্যকার ব্যবধানও চিনতে পারবে।

ভবিষ্যতের লড়াই

ইসরাইল হয়তো বিভিন্ন চুক্তি চাপিয়ে দিতে, বন্দরগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং সরকারগুলোর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আনুগত্য নিশ্চিত করার ক্ষমতা তার নেই।

এখানেই আমাদের দায়িত্বের শুরু। ক্রমবর্ধমান সচেতনতাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণাকেন্দ্র, গণমাধ্যমের উদ্যোগ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সুসংগঠিত মানবাধিকার ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করতে হবে। এসব উদ্যোগকে পরিচালিত করতে হবে মুক্তি ও পুনর্গঠনের একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে।

যে সচেতনতা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয় না, তা সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে। একইভাবে, যে ক্ষোভ কোনো বাস্তবমুখী উদ্যোগে পরিণত হয় না, তা শেষ পর্যন্ত সেই মানুষদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যারা ওই ক্ষোভ ধারণ করে।

ইসরাইলের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কেবল আরেকটি সামরিক শক্তির উত্থান নয়; বরং এমন একটি আরব ও মুসলিম প্রজন্মের আবির্ভাব, যার সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও যুক্ত হবে এবং যারা আধিপত্য ও দখলদারিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যৎ প্রত্যাখ্যান করার মতো জ্ঞান ও দৃঢ়সংকল্প ধারণ করবে।

ইসরাইল হয়তো আজ তার ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানো মানেই সেই অবস্থান চিরস্থায়ী হওয়ার নিশ্চয়তা নয়। ইতিহাসে কোনো আধিপত্যই চিরকাল স্থায়ী হয়নি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন– "আর যা ফেনা, তা শুকিয়ে চলে যায়; আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিনে থেকে যায়।" (সূরা আর-রাদ, ১৩:১৭)

গত কয়েক দশকে যদি অঞ্চলটিকে ইসরাইলের স্বার্থের অনুকূলে পুনর্গঠিত হতে দেখা গিয়ে থাকে, তবে আশা করা যায়, আগামী দশকগুলোতে এমন মানুষ গড়ে উঠবে, যারা এই আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা পরিবর্তন করার সক্ষমতা অর্জন করবে।

জায়নবাদী প্রকল্পের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিহত ও অবসানের প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব, যা অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে মুক্ত এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত। এ ধরনের নেতৃত্বের লক্ষ্য হবে না পদ-পদবি কিংবা ব্যক্তিগত মর্যাদা অর্জন। বরং তারা নিষ্ঠার সঙ্গে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে এবং ফিলিস্তিন ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর স্বার্থকে অন্য সব বিবেচনা ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে স্থান দেবে।

এটি কেবল কোনো আলংকারিক আকাঙ্ক্ষা নয়, যা বাস্তব কাজের বিকল্প হতে পারে; বরং এটি এমন একটি প্রজন্মের ঐতিহাসিক দায়িত্ব, যার প্রস্তুতি ও বিকাশে আমাদের এখন থেকেই সহায়তা করা শুরু করতে হবে। ■

কেন উপদেশ কুরআনের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে





গওহর কাদির ওয়ানি

পিএইচডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ), আলিগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারত

কুরআনের ‘তাজকির’ (tadhkīr)–অর্থাৎ উপদেশ বা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ধারণাটি আরবি মূল বর্ণ ‘জাল, কাফ, রা’ (ذ-ك-ر) থেকে উদ্ভূত। পবিত্র কুরআনে এই মূলবর্ণ থেকে সৃষ্ট শব্দগুলো ১৯টি ভিন্ন রূপ নিয়ে মোট ২৯২ বার এসেছে। ‘জাকারা’ (৭৩ বার), ‘জুকিরা’ (১১ বার), ‘জাক্কারা’ (৮ বার), ‘জুক্কিরা’ (১০ বার) এবং ‘জিকরুন’ (৭৬ বার)-এর মতো শব্দগুলো সবই একই মূল থেকে উৎসারিত। ভাষার এই অনন্য প্রাচুর্যই প্রমাণ করে যে, কুরআনের বিশ্ববীক্ষায় বা জীবনদর্শনে উপদেশের গুরুত্ব কতটা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, স্বয়ং কুরআনের বেশ কয়েকটি নাম–যেমন জিকর, তাজকিরাহ এবং জিকরা–এই একই মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে, কুরআন কেবল উপদেশ ধারণই করে না; এটি সমগ্রভাবে একটি উপদেশের গ্রন্থ। এর ভেতরের প্রতিটি শিক্ষা মানুষকে জাগ্রত করতে, মনে করিয়ে দিতে এবং সঠিক পথ দেখাতে তৈরি করা হয়েছে।

উপদেশ হিসেবে কুরআন: নির্বাচিত আয়াতসমূহ

নিচে উল্লিখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে কুরআনকে উপদেশ বা স্মারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে:

- 'কখনই নয়, এটি তো এক উপদেশ।' (৭৪:৫৪) (উল্লেখ্য: মূল লেখায় আয়াত নম্বর অসম্পূর্ণ ছিল)
- 'এটি বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।' (৮১:২৭)
- 'আমরা তোমার কাছে যে আয়াত পাঠ করি তা নিদর্শন এবং প্রজ্ঞাময় উপদেশ।' (৩:৫৮)
- 'এটি মানুষের জন্য এক স্পষ্ট বর্ণনা, এবং খোদাভীরুদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ।' (৩:১৩৮)
- 'সোয়াদ। উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ।' (৩৮:১)
- 'এটি তো সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য এক উপদেশ মাত্র।' (৩৮:৮৭)
- 'আমি মানুষের (উপদেশের) জন্য এই কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' (৩৯:২৭)
- 'আর আমি কুরআনকে বোঝার ও স্মরণ রাখার জন্য সহজ করে দিয়েছি; তবে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে?' (৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০)
- 'ত্বা-হা। আমি তোমার ওপর কুরআন এ জন্য নাজিল করিনি যে তুমি কষ্টে পড়বে, বরং কেবল যে ভয় করে তার জন্য উপদেশস্বরূপ।' (২০:১-৩)
- 'আর নিশ্চয়ই এটি মুত্তাকিদের (খোদাভীরু) জন্য এক উপদেশ।' (৬৯:৪৮)
- 'আর এটি একটি বরকতময় উপদেশ যা আমি নাজিল করেছি! তবে কি তোমরা তা অস্বীকার করবে?' (২১:৫০)

'জাল, কাফ, রা' মূলবর্ণযুক্ত আয়াতগুলোর বাইরেও আরও অনেক আয়াত উপদেশের প্রয়োজনীয়তাকে পুনর্ব্যক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের দায়িত্বকে চারটি প্রধান কাজের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে: তিলাওয়াতে আয়াত (নিদর্শন আবৃত্তি), তালীমুল কিতাব (কিতাব শিক্ষা দেওয়া), তালীমুল হিকমাহ (প্রজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া) এবং তাজকিয়া (আত্মশুদ্ধি)। এই সবকিছুরই মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাদের অস্তিত্বের সত্যতা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের আচরণকে সংশোধন করা।

এমনকি ঐশ্বরিক বাণী পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিটিও উপদেশের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তৈরি। আল্লাহ রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন: "তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ এবং সর্বোত্তম যুক্তির মাধ্যমে" (১৬:১২৫)। তাঁকে এমনভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার

ঐশ্বরিক বাণী পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিটিও উপদেশের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তৈরি। আল্লাহ রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন: "তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ এবং সর্বোত্তম যুক্তির মাধ্যমে" (১৬:১২৫)

নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যা শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করে (৪:৬৩)।

উপদেশের উদ্দেশ্য ও মিশন

সুতরাং, কুরআন স্মারক ও উপদেশের এক জীবন্ত প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা মানুষকে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য গঠিত। এটি 'আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনা' প্রকাশ করে এবং মানুষকে তাদের সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবনযাপন করার আহ্বান জানায়। এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই পয়গম্বরদের পাঠানো হয়েছিল–যারা আনুগত্যকারীদের সুসংবাদ (তাবশীর) দেন এবং অস্বীকারকারীদের চিরন্তন পরিণতির ভয় (ইনজার) দেখান।

এর বিপরীতে, মুমিনদের আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা এই বার্তা সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়, যাতে আল্লাহর দরবারে কারও কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে। এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজটি 'দাওয়াহ' নামে পরিচিত, আর এর জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'জিহাদ'। একসঙ্গে এই উপাদানগুলো সেই ব্যবস্থার রূপ দেয়, যার মাধ্যমে কুরআনের উপদেশের মিশন বাস্তবায়িত হয়–যাতে মানুষ তওবা করে তাদের রবের দিকে ফিরে আসে।

কুরআনের এই নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানরা 'তাজকির' সাহিত্যের (যা 'মাওয়ায়িজ' নামেও পরিচিত) এক অসাধারণ ভাণ্ডার তৈরি করেছে। এই বিপুল সৃষ্টিকর্ম আত্মশুদ্ধি এবং মানুষের আচরণ সংশোধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ■



একজন আমেরিকান মুসলিমের কি ব্যতিক্রমী অবস্থান রয়েছে?

– রোজিনা আলী

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষের উত্থান ও বহুমাত্রিক প্রকাশ নিয়ে প্রকাশিত তাঁর নতুন বই সম্পর্কে কথা বলেছেন সাংবাদিক রোজিনা আলী। রোজিনা আলী একজন সাংবাদিক ও নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। তিনি টাইপ মিডিয়া সেন্টার ও নিউ আমেরিকার ফেলো। এর আগে তিনি দ্য কায়রো রিভিউ অব গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স-এর জ্যেষ্ঠ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রোজিনা আলী মূলত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ, ইসলামবিদ্বেষ, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন। তাঁর লেখা দ্য নিউ ইয়র্কার, হার্পার'স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স, দ্য নেশন এবং দ্য আমেরিকান প্রসপেক্টসহ বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিকতায় প্রতিবেদন তৈরির জন্য তিনি ন্যাশনাল ম্যাগাজিন অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন।

কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক কর্মসূচি এবং ম্যালকম এইচ. কের কার্নেগি মিডল ইস্ট সেন্টারের ব্লগ 'দিওয়ান' আঞ্চলিক বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে। এই সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক মাইকেল ইয়ং কথা বলেছেন রোজিনা আলীর সঙ্গে।

রোজিনা আলীর সদ্য প্রকাশিত বই Seasons of Fury: Four Families and the Rise of Islamophobia (পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস, ২০২৬) ২০২৬ সালের ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডের দীর্ঘ তালিকায় স্থান পেয়েছে। অক্টোবরের শুরুতে তাঁর নতুন বই নিয়ে আলীর সাক্ষাৎকার নেয় 'দিওয়ান'। নিচে তার সাক্ষাতকারের বিস্তারিত :

মাইকেল ইয়ং : যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষ কতটা বিস্তৃত? আপনার বইয়ের উপসংহারে আপনি লিখেছেন, "সত্য হলো, এটি এখানে রয়েছে।" এরপর বলেছেন, এটি আমেরিকার একটি বাস্তবতার গল্প। তবে আপনি এ-ও বলেছেন, আমেরিকার আরেকটি গল্প রয়েছে। বিষয়টি কি ব্যাখ্যা করবেন?

রোজিনা আলী : প্রথমেই বলি, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিরোধী বৈষম্য যে বাস্তব, তা প্রমাণ করাও ছিল এই বই লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য। অনেক আমেরিকান বিষয়টি স্বীকার করেন না; কেউ কেউ মনে করেন, এটি সম্পূর্ণ মনগড়া অভিযোগ। গত কয়েক দশকে মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষ কীভাবে এবং কেন আরও বেড়েছে, তা ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি এই বৈষম্যের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি ছিল। এ কারণেই উপসংহারে লিখেছি, "সত্য হলো, এটি এখানে রয়েছে।"

এটিও সত্য যে অতীতের তুলনায় ইসলামবিদ্বেষ এখন আরও তীব্র। জ্যেষ্ঠ নীতিনির্ধারকদের–এমনকি প্রেসিডেন্টের–এবং বিভিন্ন ভাষ্যকারের পক্ষ থেকে মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে যে বিষোদ্গার করা হচ্ছে, তা আমি আগে কখনো এ মাত্রায় দেখিনি।

তবে যুক্তরাষ্ট্র ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক–উভয় দিক থেকেই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় একটি দেশ। উদাহরণ হিসেবে নিউইয়র্কের কথা বলা যায়। জোহরান মামদানির বিরুদ্ধে মুসলিমবিদ্বেষী প্রচারণা চালানো হলেও তা ভোটারদের ভয় দেখাতে পারেনি। এ ধরনের গোঁড়ামি এখনো রয়েছে, কিন্তু মামদানি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছেন। মিশিগানেও দেখা যাচ্ছে, একই ধরনের মুসলিমবিরোধী বক্তব্য অতীতের মতো ব্যাপকসংখ্যক মার্কিন ভোটারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।

এর কারণ শুধু মামদানির প্রভাব নয়। বরং গত কয়েক দশকে ঘটে যাওয়া একাধিক পরিবর্তন এর পেছনে কাজ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ও জনপরিসরে মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি, নীতিনির্ধারকদের প্রতি মার্কিন জনগণের হতাশা বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে সমালোচনা করার ও অন্যের সমালোচনা শোনার মানসিকতা তৈরি হওয়া।

আমার বইয়ে যুক্তি দিয়েছি, ব্যাপক ইসলামবিদ্বেষ সময়ের সঙ্গে রূপ বদলেছে এবং আমাদের নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ফল হিসেবেই এর বিস্তার ঘটেছে। এর অর্থ, আমেরিকান সমাজে ইসলামবিদ্বেষ চিরস্থায়ী সমস্যা হয়ে থাকতেই হবে–এমন নয়।

মাইকেল ইয়ং : একজন মুসলিম আমেরিকান হিসেবে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বইটি লেখার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে?

রোজিনা আলী : পাঠকেরা লক্ষ করতে পারেন, বইয়ের বর্ণনায় আমি নিজে খুব কমই উপস্থিত হয়েছি। পুরো বইয়ে মাত্র কয়েকবার আমার কথা এসেছে। কারণ, অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে নিজের পরিচয় ও পটভূমি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেও পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হতো।

শুরুতেই এটি স্পষ্ট করা জরুরি ছিল যে মুসলিম আমেরিকান হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও সেখানে নিজের অবস্থান সম্পর্কে আমার উপলব্ধিকে প্রভাবিত করেছে। এই অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত আমাকে প্রকল্পটি হাতে নিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

একই সঙ্গে, মুসলিম আমেরিকানদের ধর্ম পালনের পদ্ধতি যে এক রকম নয় এবং তাঁদের বিশ্বাস যে বিশ্ব সম্পর্কে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও উপলব্ধিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে–সে বিষয়ে আমার জ্ঞান পুরো বইটিকে প্রভাবিত করেছে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে মুসলিমদের সম্পর্কে প্রচলিত মার্কিন ধারণাকে প্রশ্ন করতে সাহায্য করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদবিরোধী নজরদারি ব্যবস্থা, আদালতে সন্ত্রাসবাদের মামলাগুলোর বিচারপ্রক্রিয়া এবং ইসলাম নিয়ে নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষের আলোচনার ধরন অনুসন্ধান করার সময় এই উপলব্ধি কাজে লেগেছে।

মাইকেল ইয়ং : আপনি বইয়ের শুরুতে আরব-আমেরিকান সম্প্রদায়ের প্রথম দিককার প্রতিনিধিদের একজন আবদিন জাবারার কথা বলেছেন। তাঁর ওপর সরকারি নজরদারির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। ইসলামবিদ্বেষ ও আরববিদ্বেষের মধ্যে কি আপনি পার্থক্য করেন? অন্যভাবে বললে, রাজনৈতিক কারণে আরবদের প্রতি যে সরকারি সন্দেহ তৈরি হয়েছিল, তা কি সময়ের সঙ্গে মুসলিমদের প্রতি সন্দেহে রূপ নেয়? অর্থাৎ, ইসলাম ধর্মকেই–যদিও সেই ধারণা ভুল হতে পারে–ঝুঁকির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়?

রোজিনা আলী : যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্যকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করার একটি প্রবণতা রয়েছে। সম্ভবত ঘৃণাজনিত অপরাধের তথ্য সংগ্রহ ও পরিমাপের পদ্ধতিও এ প্রবণতাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু বাস্তবতা আরও জটিল।

ইসলামবিদ্বেষ ও আরববিদ্বেষের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে এ দুটির মধ্যে মিল ও পারস্পরিক সংযোগও রয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা আরব ও মুসলিমদের পরস্পর সম্পর্কিত বলে মনে করেন, তাঁদের চিন্তায় এ দুটি প্রায়ই একাকার হয়ে যায়।

আমার ধারণা, অধিকাংশ আমেরিকান এখনো জানেন না যে অনেক আরব মুসলিম নন এবং বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমও আরব নন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনেক সদস্যের মধ্যেও একই ধারণা ছিল।

তবে আরবদের বিরুদ্ধে সরকারি বৈষম্য এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের মধ্যে একটি অভিন্ন যোগসূত্র রয়েছে : উভয় গোষ্ঠীকেই জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হয়েছে এবং বিদেশি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে।

১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে আরবদের ওপর নির্দিষ্টভাবে নজরদারি চালানোর প্রবণতা ছিল। ১৯৯০-এর দশকে তা আরও বিস্তৃত হয়ে মুসলিমদের সামগ্রিকভাবে সন্দেহের আওতায় নিয়ে আসে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে আরব নন–এমন মুসলিমদের অভিবাসন বাড়ছিল; বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান ঘটছিল; আর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন সরকার 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে' তার প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর সন্দেহ ও নজরদারি কয়েক বছর ধরে চলছিল।

মাইকেল ইয়ং : ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পরের সময়টি সম্পর্কে বলবেন? যুক্তরাষ্ট্র সরকার তখন মুসলিমদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করেছিল? সেই সময় থেকে প্রধান শিক্ষাগুলো কী এবং এরপর পরিস্থিতিতে কি বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

রোজিনা আলী : অনেকের মনে আছে, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পরপরই প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রকাশ্যে মুসলিমদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি একটি মসজিদ পরিদর্শন করে বলেছিলেন, "ইসলাম শান্তির ধর্ম।" কিন্তু তিনি যখন এসব কথা বলছিলেন, তখনই সরকার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছিল।

তাদের ব্যবহৃত সবচেয়ে কার্যকর কৌশলগুলোর একটি ছিল অভিবাসননীতি প্রয়োগ করে হাজার হাজার মুসলিমকে আটক ও বহিষ্কার করা। সরকারের কিছু কর্মকর্তা অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করতে এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে তাদের সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। কয়েকজন কর্মকর্তার উদ্যোগে বিচার বিভাগ এমন একটি হটলাইন চালু করেছিল, যার মাধ্যমে হয়রানি ও হামলার শিকার মুসলিম আমেরিকানরা সহায়তা পেতে পারতেন।

তবে সামগ্রিকভাবে সরকার মুসলিম সম্প্রদায়গুলোকে সন্দেহের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করেছিল। মসজিদ, ইসলামি কেন্দ্র ও রেস্তোরাঁ পর্যবেক্ষণ করা হতো। শুধু অভিবাসী মুসলিমদের নয়, মার্কিন নাগরিক কিংবা সরকারের সঙ্গে কাজ করেন–এমন মুসলিমদের ফোনালাপ ও ই-মেইল যোগাযোগের ওপরও নজরদারি চালানো হয়েছিল।

১১ সেপ্টেম্বরের পরপর যে কিছু স্থূল ও ব্যাপক নজরদারি-পদ্ধতি চালু হয়েছিল–যেমন গণহারে নজরদারি কিংবা 'অনভিবাসী বিদেশি'দের জাতীয় নিবন্ধন তৈরির উদ্যোগ–সেগুলোর কিছু পরবর্তী সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের নজরদারির বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা হওয়া এর একটি কারণ; অন্যদিকে, এসব পদ্ধতির আর প্রয়োজন নেই বলেও বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু আজ সরকারের নজরদারি নেটওয়ার্ক ১১ সেপ্টেম্বরের পরের সময়ের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ও জটিল। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এখন শুধু সরকারই নজরদারি করছে না; বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত নাগরিকও এ কাজে যুক্ত হচ্ছেন।

এর বিপরীত দিকটিও রয়েছে। মুসলিমদের লক্ষ্য করে ব্যাপকভিত্তিক সরকারি নীতি গ্রহণের প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ সীমিত বলে মনে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনাস্থা বাড়ছে, একই সঙ্গে অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা–ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)–বন্ধ করার দাবিও জোরালো হচ্ছে।

ইসলামবিদ্বেষী কণ্ঠস্বর যত জোরালো হচ্ছে, অভিবাসন ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপের বিরোধিতাকারীদের কণ্ঠও তত জোরালো হচ্ছে।

মাইকেল ইয়ং : যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যায়, ইসরাইল সম্পর্কে মার্কিন জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। আপনার কি মনে হয়, এর ফলে দেশটির মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সাধারণ আমেরিকানদের মনোভাবেও পরিবর্তন আসবে?

রোজিনা আলী : ইসরাইল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বৃহত্তর যুদ্ধ নিয়ে সমালোচনা করার প্রবণতাও বাড়ছে।

ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বৃহত্তর ধারণায় প্রতিফলিত হতে সময় লাগবে। যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম–আনুমানিক ১ দশমিক ৫ শতাংশ। আর গত ৩০ বছর ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট বয়ান শুনতে শুনতে অধিকাংশ আমেরিকান তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমার মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালানো কোনো মুসলিম সশস্ত্র ব্যক্তি শুধু 'মন্দ' বলেই এমন কাজ করেন–এই বয়ান এখন আর আগের মতো সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাচ্ছে না। ইসরাইলের কঠোর সমালোচনা করেও মামদানির নির্বাচনে জয়ী হওয়া তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে এই পরিবর্তন ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বৃহত্তর ধারণায় প্রতিফলিত হতে সময় লাগবে। যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম–আনুমানিক ১ দশমিক ৫ শতাংশ। আর গত ৩০ বছর ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট বয়ান শুনতে শুনতে অধিকাংশ আমেরিকান তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

মাইকেল ইয়ং : আপনার বইয়ে কয়েকজন মুসলিমের জীবনের বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে দেখা যায়, তাঁদের কেউ কেউ নিজ নিজ এলাকায় মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রায়ই বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। যে দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেখানে মুসলিমদের ক্ষেত্রে এমন ব্যতিক্রম কেন দেখা গেল? এর পরিণতিই বা কী হয়েছে?

রোজিনা আলী : এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড সাঈদের ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থটির কথা মনে না করে পারা কঠিন। আমার অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি অন্তর্নিহিত ধারণা কাজ করেছে যে মুসলিমরা আমেরিকান হওয়ার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় 'বিদেশি'। তাঁদের সঙ্গে ক্ষতিকর বিদেশি প্রভাব–অর্থ ও আদর্শ–দেশে প্রবেশ করবে বলেও আশঙ্কা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দীর্ঘদিনের সন্দেহের একটি বড় কারণ হলো বিদেশি অর্থায়ন, বিশেষ করে আরব দেশগুলোর অর্থ। সমালোচকদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনও নয়। ১১ সেপ্টেম্বরের আগেই সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মসজিদে অর্থায়ন করেছিল।

এর মধ্যে একটি বড় ধরনের বিদ্রূপ রয়েছে। বর্তমানে উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষিসহ জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

এ ছাড়া ১৯৯০-এর দশকে মার্কিন সরকারের সন্ত্রাসবাদবিরোধী কার্যক্রমের বড় একটি অংশ ছিল সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের অর্থায়নের উৎস শনাক্ত করা। ২০০১ সালের পর এ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়। এর ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো প্রায়ই ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল।

স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা দেখা গেছে, তার পেছনে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে পুরোনো ও নতুন–উভয় ধরনের ধারণা কাজ করেছে। এর মধ্যে ছিল অর্থায়ন, উগ্রবাদী আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া এবং মুসলিমদের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ।

অভিযোগগুলোর মূল বক্তব্য ছিল, মুসলিমরা কোনোভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে কলুষিত করবেন। এ ধারণা একদিকে ধর্মটি কীভাবে পালিত হয়, সে সম্পর্কে ভুল বোঝাপড়ার পরিচয় দেয়; অন্যদিকে সমাজ কীভাবে কাজ করে, সে বিষয়েও অপর্যাপ্ত উপলব্ধি প্রকাশ করে।

অবশ্য মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আদালতে আইনি চ্যালেঞ্জ জানানোর ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা ছিল বিচ্ছিন্ন। কোনো একটি শহরে মামলা জেতা গেলেও অন্য শহরে হেরে যেতে হয়েছে।

ফলে সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র এখনো সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি যে আমেরিকায় ইসলামের স্থান আছে কি না। টেক্সাসে ইসলামের দৃশ্যমান ধর্মীয় প্রকাশ নিষিদ্ধ করার উদ্যোগগুলোর দিকে তাকালেই বিষয়টি বোঝা যায়।

মাইকেল ইয়ং : আপনার বইয়ের একটি প্রধান চরিত্রের পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে আপনি যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন, তাকে আমি 'মাইনরিটি রিপোর্ট' ঘটনা বলতে চাই। এখানে মুসলিমদের এমন অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা তাঁরা করেননি; বরং ভবিষ্যতে করে ফেলতে পারেন–এমন আশঙ্কায় তাঁদের আটক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য অপরাধ ঠেকানোর নামে যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা কীভাবে এ ধরনের পদক্ষেপকে বৈধতা দিয়েছে, যখন তা বড় ধরনের আইনি সমস্যার জন্ম দেয়?

রোজিনা আলী : জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে নাগরিক ও সাংবিধানিক অধিকার ক্রমে সংকুচিত করার মাধ্যমে এটি করা হয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বরের পর যেসব আইন ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেগুলোর অনেকগুলোই ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা সেগুলোকে পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

তবে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমরা একটি নতুন চিন্তাকাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করি। সেটি ছিল অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করার ধারণা।

সেই সময় ভয় ও অনিশ্চয়তা ছিল অত্যন্ত প্রবল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারি কর্মকর্তা, কৌঁসুলি, আদালত ও কারাগারব্যবস্থা–সবাই আরেকটি হামলা ঠেকানোর সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছিল।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সরকারি সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা হয়েছিল এবং তাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছিল। হামলা সংঘটিত হওয়ার আগেই অপরাধীদের ধরে ফেলার সাফল্য দেখানোর চাপ তাদের ওপর ছিল। একই সময়ে আদালতগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নির্বাহী বিভাগকে নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাড় দিয়েছিল। এমনকি যেসব সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে অপরাধের কোনো সম্পর্ক ছিল না, তারাও নজরদারির আওতায় পড়েছিলেন।

এর ফলে এমন শত শত ঘটনা ঘটেছে, যেগুলোতে সন্দেহভাজনদের অপরাধে প্ররোচিত করে ফাঁদে ফেলার অভিযোগ উঠেছে–কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগগুলো ছিল অত্যন্ত জোরালো, এমনকি সরাসরি ফাঁদে ফেলার ঘটনাও ছিল।

পরিণামে ১১ সেপ্টেম্বরের পরবর্তী বছরগুলোতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর প্রভাব এখনো রয়ে গেছে।

মাইকেল ইয়ং : সবশেষে জানতে চাই, ইসলামবিদ্বেষকে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিবিদ্বেষের মতো ব্যাপকভাবে নিন্দিত বৈষম্যে পরিণত করতে কী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? কারণ, দেশটির মূলধারার রাজনীতিবিদ ও জনপরিচিত ব্যক্তিদের অনেকেই নিয়মিত মুসলিমদের সম্পর্কে নিন্দনীয় মন্তব্য করেন।

রোজিনা আলী : প্রথমত, ইসলামবিদ্বেষ যে একটি ব্যাপক ও বিদ্যমান বৈষম্য–তা স্বীকার করতে হবে। ইসলাম বা মুসলিমদের অবমাননা করেন, এমন অনেকেই নিজেদের অবস্থানকে 'যুক্তিসংগত' বলে দাবি করেন।

দ্বিতীয়ত, রাজনীতিবিদদের আরও বেশি সংখ্যায় মুসলিমবিরোধী বক্তব্য ও হামলার নিন্দা জানাতে হবে। প্রায়ই দেখা যায়, এ ধরনের গোঁড়ামি উপেক্ষা করা হয়।

তৃতীয়ত, মুসলিমদের সঙ্গে 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটির যে সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে, তা সচেতনভাবে আলাদা করতে হবে। শব্দটি এত বেশি রাজনৈতিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে এর অর্থও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমার বইয়ের মাধ্যমে যে যুক্তিটি তুলে ধরতে চেয়েছি, তা হলো–মুসলিমরাও ঘৃণা ও সহিংসতার শিকার হতে পারেন; আবার নিজেদের 'প্রকৃত আমেরিকান' বলে বিবেচনা করা মানুষও সহিংসতার অপরাধী হতে পারেন।

কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীরই নিষ্ঠুরতার ওপর একচেটিয়া অধিকার নেই। কোনো গোষ্ঠীই স্বভাবগতভাবে অনন্য বা একমাত্র অশুভ নয়। ■

মাইকেল ইয়ং: *সম্পাদক, 'দিওয়ান'; জ্যেষ্ঠ সম্পাদক, ম্যালকম এইচ. কের কার্নেগি মিডল ইস্ট সেন্টার।*

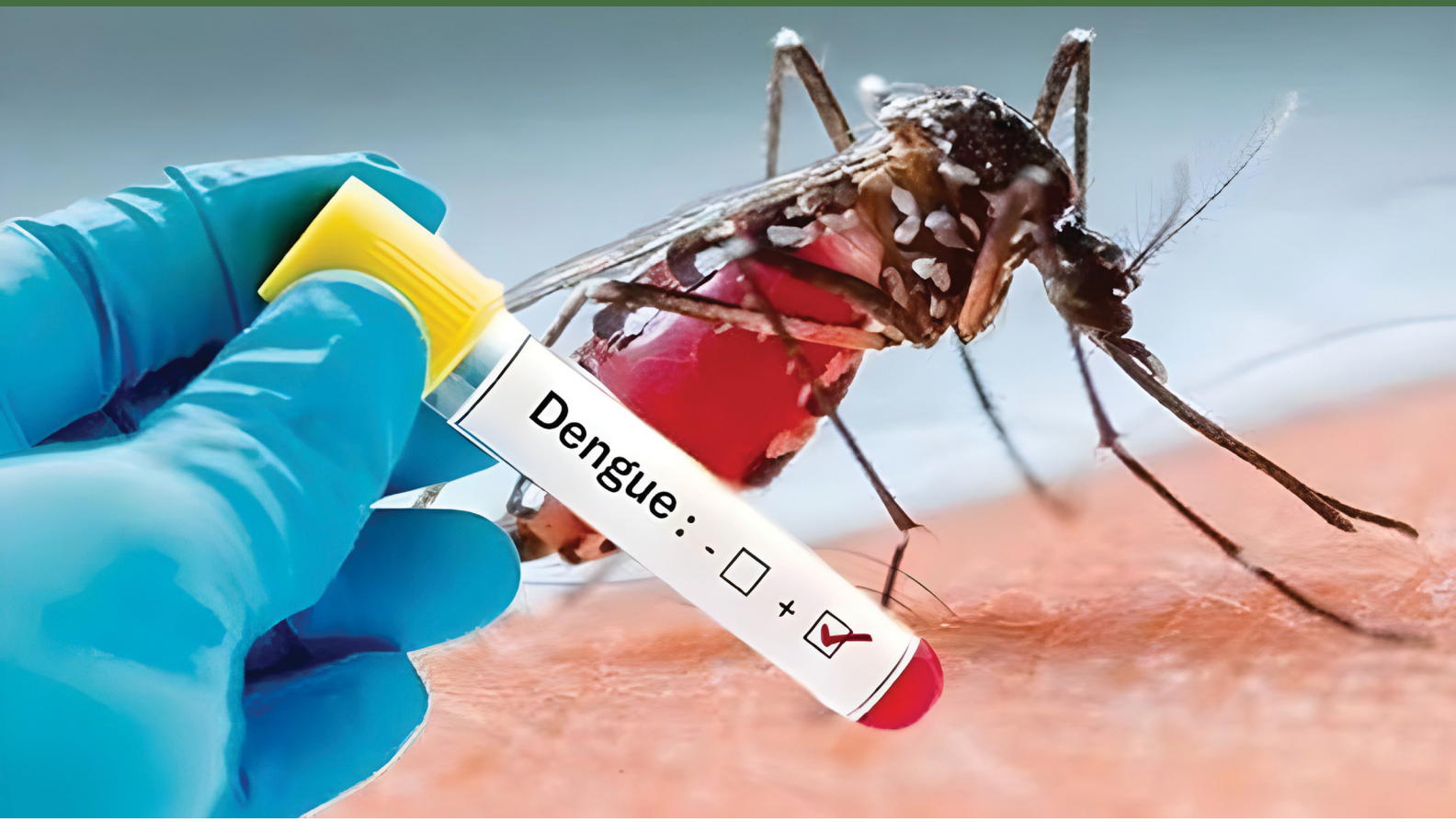

বাংলাদেশের ডেঙ্গু সংকট: মৃত্যুর মিছিলে জনআতঙ্ক ও প্রতিরোধে টিকাদান

প্রফেসর ড. শাহজাহান খান (OAM)

অস্ট্রেলিয়ার সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের প্রবাসী ফেলো এবং ঢাকার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সাবেক উপাচার্য।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মশা নিধন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, টিকাদানের উপযোগিতা মূল্যায়ন, হাসপাতালের প্রস্তুতি জোরদার এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য নিশ্চিত করার সমন্বিত জাতীয় কৌশল এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

সম্প্রতি আমাদের এক নিকটাত্মীয় ঢাকার একটি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর; সে ছিল একজন মেধাবী স্কুলছাত্রী। তার বাবা চিকিৎসক, দাদাও চিকিৎসক এবং চাচাদের মধ্যেও কয়েকজন চিকিৎসক রয়েছেন। পরিবারের চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞান ও সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তার অকালমৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হয়নি।

সে শুধু শ্রেণিকক্ষেই মেধাবী ছিল না, খেলাধুলা ও অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমেও ছিল উজ্জ্বল। তার দুই ছোট বোনও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তারা বেঁচে গেলেও তাদের যথেষ্ট কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। এই পরিবার, বিশেষ করে তার বাবা-মা ও বোনেরা এমন এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে, যা কোনো পরিবারেরই সহ্য করার কথা নয়।

এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়, ডেঙ্গু কারও শিক্ষা, পেশা, সামাজিক অবস্থান কিংবা চিকিৎসাসেবা পাওয়ার সুযোগ বিবেচনা করে আক্রমণ করে না।

ডেঙ্গু এখন আর মৌসুমি কোনো বিড়ম্বনা নয়, যা মানুষকে নীরবে সহ্য করে যেতে হবে। এটি একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য

সংকট। এ সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজন জরুরি, দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ। প্রতিটি প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু আমাদের সামনে প্রশ্ন তোলে–আর কী করা সম্ভব ছিল এবং অন্যদের জীবন রক্ষায় এখন কোন পরিবর্তনগুলো আনা জরুরি?

সংক্রমণ ও মৃত্যুর উদ্বেগজনক চিত্র

বাংলাদেশে বারবার ডেঙ্গুর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর ভয়াবহতায় পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, উল্লিখিত বছরগুলোর মধ্যে ২০২৩ সাল ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। ওই বছর দেশে ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন এবং ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়।

২০২৪ ও ২০২৫ সালেও ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০২৬ সালের ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে, চলতি বছরে ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৪৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৩৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, এসব পরিসংখ্যান চলতি বছরের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য; এগুলো চূড়ান্ত বার্ষিক হিসাব নয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিবন্ধিত সংখ্যা নিচে তুলে ধরা হলো:

বছর	আক্রান্তের সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা
২০১৬	৬,০৬০	১৪
২০১৭	২,৭৬৯	৮
২০১৮	১০,১৪৮	২৬
২০১৯	১,০১,৩৫৪	১৭৯
২০২০	১,১৯৩	৩
২০২১	২৮,৪২৯	১০৫
২০২২	৬১,৭৩২	২৮১
২০২৩	৩,২১,১৭৯	১,৭০৫
২০২৪	১,০১,২১৪	৫৭৫
২০২৫	১,০২,৮৬১	৪১৩
২০২৬*	১,২৩,৯৪৮	৩৮৪

সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু ড্যাশবোর্ড। ২০২৬ সালের তথ্য ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

এই পরিসংখ্যান মূলত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে শনাক্ত হওয়া ও নথিভুক্ত রোগীর সংখ্যা নির্দেশ করে; সমাজে সংক্রমিত প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব এতে অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃত সংক্রমণের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে, কারণ আক্রান্ত সবাই চিকিৎসাসেবা নেন না কিংবা তাঁদের সবার রোগ নির্ণয় নিশ্চিত হয় না। তা সত্ত্বেও, এই পরিসংখ্যান পরিবার, হাসপাতাল ও জাতীয় অর্থনীতির ওপর ডেঙ্গুর বিপুল চাপের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে।

প্রতিটি মৃত্যুর পেছনে রয়েছে একটি শোকাহত পরিবার। প্রতিটি হাসপাতালে ভর্তির পেছনে রয়েছে যন্ত্রণা, অনিশ্চয়তা এবং জীবনসংহারী জটিলতার আশঙ্কা নিয়ে লড়াই করা একজন মানুষ। এগুলো সরকারি প্রতিবেদনের নিছক কিছু সংখ্যা নয়; প্রতিটি সংখ্যা একটি মানবজীবনের গল্প এবং দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতির প্রতিচ্ছবি।

কেন আমরা এখনো এতটা অরক্ষিত?

ডেঙ্গু মূলত সংক্রমিত এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এসব মশা মানুষের বসতবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশে বংশবিস্তার করে। বিভিন্ন ধরনের পাত্র, পরিত্যক্ত প্লাস্টিক সামগ্রী, ফুলের টব, ছাদের নালা, নির্মাণাধীন ভবন, খোলা পানির পাত্র এবং যেখানে পানি জমে থাকে, এমন অন্যান্য স্থান মশার প্রজননক্ষেত্রে পরিণত হয়।

ডেঙ্গুর সমস্যা এখন আর শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ নেই; এটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং শহর ও গ্রাম–উভয় এলাকার মানুষকে আক্রান্ত করছে। ঘনবসতি, অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্বল পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা, অনিয়মিত পানি সরবরাহ, দ্রুত নগরায়ণ এবং মশা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাব ডেঙ্গু প্রতিরোধকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিস্থিতিও মশার বংশবিস্তার এবং ডেঙ্গু সংক্রমণে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করার পর কেবল কীটনাশক ছিটানো কোনো দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে না। প্রাদুর্ভাব যখন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, ততক্ষণে সংক্রমণ অনেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

তাই কর্তৃপক্ষকে বিচ্ছিন্ন ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বছরব্যাপী ও গবেষণাভিত্তিক মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, যাতে প্রজননক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করে প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নির্মূল করা যায়।

কিউডেঙ্গা (Qdenga): বাংলাদেশের কি ডেঙ্গুর টিকা চালু করা উচিত?

২০২৪ সালে আমি নিজে চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের বিষয়টি আমার কাছে আরও ব্যক্তিগত গুরুত্ব পায়। সেই কষ্টকর অভিজ্ঞতা এ ধরনের রোগ সম্পর্কে আমার উদ্বেগ এবং কার্যকর প্রতিরোধব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

অস্ট্রেলিয়ায় সাম্প্রতিক এক সফরের সময় আমি 'কিউডেঙ্গা' (Qdenga) নামের ডেঙ্গুর একটি টিকা সম্পর্কে জানতে পারি। বিষয়টি আমাকে বিস্মিত করে যে, বাংলাদেশে আমাদের প্রচলিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ডেঙ্গুর টিকাদান নিয়মিত কোনো ব্যবস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নেই।

বাংলাদেশে কিউডেঙ্গা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক টিকার প্রাপ্যতা, নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের অবস্থা, ব্যয় এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য সেগুলোর উপযোগিতা সরকারকে অবিলম্বে পর্যালোচনা করতে হবে। নিয়মিত জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে ডেঙ্গুর টিকা অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।



বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এমন এলাকাগুলোর ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের কিউডেঙ্গা টিকা দেওয়ার সুপারিশ করেছে, যেখানে ডেঙ্গুর সংক্রমণ তীব্র এবং রোগটি উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করেছে। টিকাটি টিএকে-০০৩ (TAK-003) নামেও পরিচিত। এর নির্ধারিত কোর্সে তিন মাসের ব্যবধানে দুটি ডোজ গ্রহণ করতে হয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জোর দিয়ে বলেছে, টিকাদানকে অবশ্যই সমন্বিত ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কৌশলের অংশ হতে হবে; কারণ এই টিকা সব ক্ষেত্রে এককভাবে সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না।

বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, স্কুলগামী শিশু ও কিশোর-কিশোরীরাও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে কোনো টিকা চালু করার আগে স্থানীয়ভাবে রোগের ধরন, বয়সভিত্তিক হাসপাতালে ভর্তির হার, টিকার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত প্রমাণ, নিয়ন্ত্রক অনুমোদন, সরবরাহব্যবস্থা, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এবং টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা ও তদারকির সক্ষমতা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

এ লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, মহামারিবিদ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ, টিকাদান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদদের নিয়ে সরকারকে অবিলম্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করা উচিত। কমিশনকে মূল্যায়ন করতে হবে, উচ্চ সংক্রমণপ্রবণ এলাকা ও উপযুক্ত বয়সের জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে টিকাদান কর্মসূচি চালু করলে তা ব্যয়, নিরাপত্তা ও বাস্তবায়নের শর্ত বিবেচনায় যথেষ্ট জনস্বাস্থ্যগত সুফল দিতে পারবে কি না।

গবেষণা ও মূল্যায়নের ফলাফল টিকাদান কর্মসূচি চালুর পক্ষে গেলে বাংলাদেশের একটি স্বচ্ছ টিকাদান নীতি প্রণয়ন করা উচিত। এতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করার পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যে টিকা সংগ্রহের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও টিকা প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে অংশীদারত্ব গড়ে তোলা এ ক্ষেত্রে টিকার প্রাপ্যতা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।

তবে টিকাদানকে ডেঙ্গু প্রতিরোধের একমাত্র সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। মশা নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণ এবং কার্যকর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি টিকাদানকে একটি পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় ডেঙ্গু কৌশলের পাঁচটি অগ্রাধিকার

১. মশার প্রজননক্ষেত্র নির্মূল করা

ডেঙ্গু প্রতিরোধের কার্যক্রম শুরু করতে হবে বাসাবাড়ি, পাড়া-মহল্লা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, নির্মাণাধীন ভবন এবং জনসমাগমস্থল থেকে। প্রতিটি পরিবারকে নিয়মিত জমে থাকা পানি খালি করতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে কিংবা ঢেকে রাখতে হবে। একই সঙ্গে বর্জ্য সংগ্রহ ও পানি নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। নির্মাণাধীন ভবন ও সরকারি স্থাপনাগুলোও নিয়মিত পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে।

সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোর উচিত পরিদর্শনের সময়সূচি প্রকাশ করা, মশার প্রজননক্ষেত্রের অবস্থান সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিত করা এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলাফল জনসমক্ষে তুলে ধরা। কীটনাশকের ব্যবহার হতে হবে কারিগরি প্রমাণের ভিত্তিতে এবং এর কার্যকারিতাও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শুধু দৃশ্যমান রাস্তায় কীটনাশক ছিটিয়ে প্রজননক্ষেত্রগুলো অপরিবর্তিত রাখলে ডেঙ্গু সমস্যার সমাধান হবে না।

২. টেকসই জাতীয় জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালু করা

দেশব্যাপী ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যাপক প্রচারাভিযান প্রয়োজন। বড় কোনো স্বাস্থ্যসংকট মোকাবিলায় জনসচেতনতা তৈরির মতো গুরুত্ব দিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

টেলিভিশন, বেতার, সংবাদপত্র, ডিজিটাল মাধ্যম, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও স্থানীয় সংগঠন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রচারাভিযানে ডেঙ্গু কীভাবে ছড়ায়, মশার কামড় থেকে কীভাবে সুরক্ষিত থাকা যায়, কীভাবে প্রজননক্ষেত্র অপসারণ করতে হয় এবং কখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি–এসব বিষয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। তথ্য সহজবোধ্য বাংলায় উপস্থাপন করতে হবে এবং স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

নাগরিকদের বুঝতে হবে, ডেঙ্গু প্রতিরোধ সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। তবে এই দায়িত্ব পালনের পুরো ভার শুধু ব্যক্তিগত পরিবারগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উন্নত পানি নিষ্কাশন, নিয়মিত পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের মূল দায়িত্ব।

৩. টিকাদানের উপযোগিতা মূল্যায়ন করে প্রয়োজন অনুযায়ী চালু করা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বর্তমান নির্দেশনা এবং বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক ও আইনগত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে কিউডেঙ্গা ও অন্যান্য উপযুক্ত ডেঙ্গুর টিকা মূল্যায়নের জন্য সরকারকে বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে একটি ত্বরিত প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে

হবে। মূল্যায়নের ভিত্তিতে টিকাদানের সুপারিশ করা হলে কর্মসূচিতে স্পষ্ট যোগ্যতার মানদণ্ড, নির্ভরযোগ্য সরবরাহব্যবস্থা, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ এবং স্বচ্ছ মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জনমতের আবেগের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই সঙ্গে অনিশ্চয়তাকে দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মূল্যায়ন শেষ করে এর ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

৪. হাসপাতালের প্রস্তুতি ও প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা জোরদার করা

ডেঙ্গুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যাতে সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা পান, তা নিশ্চিত করাও সমান জরুরি। হাসপাতালগুলোতে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী, পর্যাপ্ত রোগী পর্যবেক্ষণব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য রোগ নির্ণয়ের সুবিধা, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং গুরুতর রোগী শনাক্ত করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে পারে। এমনকি জ্বর কমে যাওয়ার সময়ও গুরুতর জটিলতা দেখা দিতে পারে। তীব্র পেটব্যথা, বারবার বমি, রক্তপাত, অস্বাভাবিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা বা অস্থিরতার মতো বিপদচিহ্ন দেখা দিলে জরুরি চিকিৎসা মূল্যায়ন প্রয়োজন। ডেঙ্গুর নির্দিষ্ট কোনো ভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা নেই; তাই যথাযথ সহায়ক চিকিৎসা এবং জটিলতা দ্রুত শনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো পরিবারকে যেন বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে না যায় যে তাদের প্রিয়জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের মধ্যে কার্যকর রোগী স্থানান্তরব্যবস্থা গড়ে তুললে চিকিৎসা পেতে বিলম্ব কমানো সম্ভব।

৫. রোগ নজরদারি, গবেষণা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা

কার্যকর জনস্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত অপরিহার্য। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচিত আক্রান্ত রোগী, হাসপাতালে ভর্তি, মৃত্যু, বয়সভিত্তিক তথ্য, আক্রান্ত এলাকার অবস্থান এবং প্রাদুর্ভাবের সময়কাল সম্পর্কে নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা।

সংক্রমণের কতটা অংশ শনাক্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে, ডেঙ্গু ভাইরাসের কোন ধরনের সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, মশার সংখ্যা ও বিস্তার কেমন, কীটনাশকের বিরুদ্ধে মশার প্রতিরোধক্ষমতা কতটা, টিকা কতটা উপযোগী এবং ডেঙ্গুর অর্থনৈতিক ক্ষতি কত—এসব বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে নজরদারি আরও শক্তিশালী করতে হবে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যয় এবং সেই ব্যয়ের ফলাফল নিয়ে প্রতিবছর মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত। স্বাধীন মূল্যায়নের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব হবে, কোন পদক্ষেপ কার্যকর হচ্ছে, কোথায় সম্পদের অপচয় হচ্ছে এবং কোন জনগোষ্ঠীর জন্য আরও সহায়তা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য সংস্থাগুলোকে মহামারিসংক্রান্ত গবেষণা, রোগের পূর্বাভাস তৈরির মডেল এবং ব্যয়-কার্যকারিতা বিশ্লেষণে পারস্পরিক সহযোগিতায় উৎসাহিত করতে হবে।

জাতীয় দায়িত্ব পালনে আর বিলম্ব নয়

এটি মেনে নেওয়া কঠিন যে, দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা জয় করতে সক্ষম একটি জাতিকে মশাবাহিত রোগের কারণে এত বড় মূল্য দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশ বহু কঠিন পরিস্থিতিতে স্থিতিস্থাপকতা, সম্মিলিত উদ্যোগ ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায়ও সেই একই চেতনা কাজে লাগাতে হবে।

এর সমাধান কোনো একক নাগরিককে দোষারোপ করা কিংবা মাঝেমধ্যে বিচ্ছিন্ন প্রচারাভিযান চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য পেশাজীবী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে হবে।

সরকারকে নেতৃত্ব, অর্থায়ন, সমন্বয় ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে মশার প্রজননক্ষেত্র নির্মূল এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের সময়মতো প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাসেবা দিতে হবে। গবেষকদের নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তৈরি করতে হবে। আর নাগরিকদের নিজেদের বাড়িঘর ও আশপাশের পরিবেশ মশার প্রজননমুক্ত রাখতে সচেষ্ট হতে হবে।

এসব উদ্যোগের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ডেঙ্গু টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। এই টাস্কফোর্স পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং কার্যক্রমের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশের দায়িত্ব পালন করতে পারে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেলে কেবল তখনই তৎপর হওয়ার পরিবর্তে সারা বছর ধরে এ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

১৫ বছর বয়সী সেই স্কুলছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু যেন আরেকটি পরিসংখ্যানের আড়ালে হারিয়ে না যায়। তার মৃত্যু এবং তার বোন ও পরিবারের সীমাহীন কষ্ট আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করুক, যাতে ভবিষ্যতে এমন ট্র্যাজেডি প্রতিরোধ করা যায়।

বাংলাদেশ শুধু স্লোগান কিংবা জরুরি ভিত্তিতে কীটনাশক ছিটিয়ে ডেঙ্গু নির্মূল করতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন টেকসই রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি, কার্যকর জনসেবা এবং জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণ।

প্রশ্নটি এখন আর বাংলাদেশ ডেঙ্গু মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেওয়ার সামর্থ্য রাখে কি না, তা নয়। বরং প্রশ্ন হলো, পর্যাপ্ত সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এভাবে মানুষের জীবন হারিয়ে যেতে থাকা দেশ কত দিন মেনে নেবে?

প্রতিটি প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুই একটি অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু। ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এখনই। ■



দামেস্কে সালাহউদ্দিনের মাজার সংস্কারে তুরস্কের সহায়তা

সিরিয়ার রাজধানীতে ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর সংস্কারকাজ সম্পন্ন করেছে টিআইকেএ (TİKA); সুলায়মানিয়া তেক্কিয়ার পুনর্বাসন প্রকল্পেও যুক্ত হয়েছে সংস্থাটি

আল-উম্মাহ ডেস্ক

সারসংক্ষেপ:

তুরস্ক সরকারের সংস্থা 'তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা' (TİKA) বিশ্বজুড়ে ঐতিহাসিক স্থাপনা সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে কাজ করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি সিরিয়ার রাজধানীতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সংস্থাটি।

তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা (TİKA) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে অবস্থিত বীরযোদ্ধা সালাহউদ্দিনের মাজারের সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে। ঐতিহাসিক উমাইয়া মসজিদের পাশেই এই মাজারটি অবস্থিত, যা দামেস্কের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সংস্থাটির দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক পোস্টে জানানো



তেক্কিয়া সুলায়মানিয়া: সিরিয়ার দামেস্কে বারাদা নদীর তীরে অবস্থিত উসমানীয় (অটোমান) আমলের ঐতিহাসিক স্থাপত্য কমপ্লেক্স।

হয়, মাজারটির মূল ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এর ঐতিহ্য রক্ষায় এই সংস্কার ও পুনর্বাসনকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাজারটিতে সমাহিত রয়েছেন আইয়ুবীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান সালাহউদ্দিন আল-আইয়ুবী। ১১৮৭ সালে ঐতিহাসিক হাত্তিনের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে তিনি ক্রুসেডারদের কাছ থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেছিলেন। পরবর্তীতে ১১৯৩ সালে দামেস্কে এই মহীয়সী শাসকের মৃত্যু হয়।

বিলাল আল-হাবশীর (রা.) মাজার

দামেস্কের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ধারাবাহিকতায় টিআইকেএ ২০১৬ সালের ১১ আগস্ট মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্যতম প্রিয় সাহাবি বিলাল আল-হাবশীর (রা.) মাজারের পুনর্বাসনকাজ সম্পন্ন করার কথা জানায়।

সংস্থাটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পটির আওতায় মাজারের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের দেয়াল এবং প্রধান ফটক সংস্কার করা হয়। একই সঙ্গে ঐতিহাসিক পাথর ও মার্বেলের কবরফলক পরিষ্কার, ছাদের ইনসুলেশন নবায়ন, নতুন কার্পেট স্থাপন এবং স্থাপনাটির মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘদিনের ক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোও এতে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচীন স্থাপত্যরীতি বজায় রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষিত রাখা।

সুলায়মানিয়া তেক্কিয়ার সংস্কার

দামেস্কের প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষণে তুরস্কের এই উদ্যোগ সুলায়মানিয়া তেক্কিয়া কমপ্লেক্স পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে সিরিয়ার পুরাকীর্তি ও জাদুঘর অধিদপ্তর জানায়, ঐতিহ্যবাহী এই স্থাপনাটির পুনর্বাসন সম্পন্ন করতে তারা টিআইকেএর সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি করেছে।

অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ৬ থেকে ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আনুমানিক ব্যয়ের এই প্রকল্পটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কারিগরি সমস্যা সমাধান এবং সামগ্রিক পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে হাতে নেওয়া হয়।

ষোড়শ শতকে উসমানীয় (অটোমান) সুলতান 'সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট'-এর শাসনামলে নির্মিত সুলায়মানিয়া তেক্কিয়া দামেস্কের অন্যতম সেরা স্থাপত্য নিদর্শন। বহু শতাব্দী ধরে কমপ্লেক্সটি ধর্মীয়, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এতে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ, মুসাফিরখানা ছাড়াও শিক্ষামূলক ও বাণিজ্যিক কাজের নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

২০২৬ সালের অক্টোবরের গণমাধ্যম প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই কমপ্লেক্সের সংস্কারকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং অগ্রগতির হার ৯৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। তবে প্রকল্পটিতে টিআইকেএর সরাসরি ভূমিকা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত বাকি কাজের পুরো কৃতিত্ব এককভাবে সংস্থাটিকে দেওয়া সমীচীন নয়। কারণ দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে সম্পৃক্ত থাকা আর মাঠপর্যায়ে সরাসরি সংস্কার বাস্তবায়ন করার মধ্যে কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক পার্থক্য রয়েছে।

ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে টিআইকেএ

টিআইকেএ (TİKA) তুরস্ক সরকারের বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা ও সমন্বয়বিষয়ক একটি শীর্ষ সংস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক স্থাপনা পুনর্নির্মাণ, মাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য কমপ্লেক্স পুনর্বাসনে সংস্থাটি সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে। এসব উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর প্রাচীন স্মৃতি ও সংস্কৃতিকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করে ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে জীবন্ত করে রাখা। ■



মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা



মাসুমুর রহমান খলিলী
সিনিয়র সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

বঙ্গোপসাগর থেকে ইন্দো-প্যাসিফিক: দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনায় বাংলাদেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ? এক ট্রিলিয়ন ইয়েন বিনিয়োগ, 'শেয়ার্ড প্রসপারিটি বিআইজি-বি', সমুদ্র নিরাপত্তা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগ–উন্নয়ন সহযোগিতার আড়ালে নয়, বরং তার মধ্য দিয়েই আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে জায়গা করে নিচ্ছে টোকিও

দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের ভূমিকা এখন আর কেবল উন্নয়ন সহযোগিতা, সহজ শর্তের ঋণ কিংবা অবকাঠামো নির্মাণে সীমাবদ্ধ নেই। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপথ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ, সরবরাহব্যবস্থার নিরাপত্তা, আঞ্চলিক উৎপাদনকেন্দ্র এবং সামুদ্রিক স্থিতিশীলতা–সব মিলিয়ে জাপান এ অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান গড়ে তুলছে। এ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের গুরুত্ব নতুন মাত্রা পেয়েছে ২৭ অক্টোবর টোকিওতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির শীর্ষ বৈঠকের পর।

বৈঠকে দুই দেশ বঙ্গোপসাগরীয় শিল্প প্রবৃদ্ধি বলয় বা 'বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট' (বিআইজি-বি) ধারণাকে সম্প্রসারিত করে 'বিআইজি-বি ফর শেয়ার্ড প্রসপারিটি' নামে নতুন কৌশলগত সহযোগিতা উদ্যোগ এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে জাপানি বেসরকারি বিনিয়োগ প্রায় এক ট্রিলিয়ন ইয়েনে পৌঁছানোর সম্ভাবনা এবং দুই লাখ

কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রত্যাশার কথা জানানো হয়েছে। সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদারে বাংলাদেশকে একটি টহলজাহাজ দেওয়ার সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়েছে।

এই উদ্যোগগুলোর তাৎপর্য কেবল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতিতে সীমিত নয়। এগুলোকে জাপানের বৃহত্তর 'ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক' (এফওআইপি) কৌশলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, টোকিও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে আঞ্চলিক যোগাযোগ, উৎপাদন ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার বৃহত্তর কাঠামোয় যুক্ত করতে চায়। তবে এটিকে বাংলাদেশের ওপর জাপানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বলা যেমন অতিরঞ্জিত হবে, তেমনি নিছক উন্নয়ন সহযোগিতা হিসেবে দেখলেও কৌশলগত বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়ে যাবে।

১. জাপানের বৃহত্তর লক্ষ্য: অর্থনীতি, সংযোগ ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা

জাপানের 'ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক' বা এফওআইপি ধারণার মূল লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক আইন, নৌ চলাচলের স্বাধীনতা, মুক্ত বাণিজ্য, আঞ্চলিক সংযোগ এবং স্থিতিশীলতা জোরদার করা। ২০২৩ সালে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এই কৌশলের নতুন পরিকল্পনা তুলে ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় বঙ্গোপসাগর ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে যুক্ত করে শিল্পমূল্য শৃঙ্খল গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন।

এখানে জাপানের তিনটি স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত:

- অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: জাপানি কোম্পানিগুলোকে একক উৎপাদনকেন্দ্র বা সরবরাহব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা থেকে বের করে এনে (চীন+১ কৌশল) বিকল্প উৎপাদন ও বাজারের সুযোগ তৈরি করা। বাংলাদেশ তার বৃহৎ শ্রমশক্তি, তৈরি পোশাকশিল্প, ক্রমবর্ধমান ভোক্তাবাজার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিকটবর্তী অবস্থানের কারণে এই পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ।
- সামুদ্রিক যোগাযোগের নিরাপত্তা: জাপানের জ্বালানি ও বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর-সংলগ্ন সমুদ্রপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে এ অঞ্চলে স্থিতিশীল বন্দর, নিরাপদ নৌ চলাচল, সামুদ্রিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা জাপানের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত।
- আঞ্চলিক প্রভাবের ভারসাম্য: চীনের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উপস্থিতি, ভারতের আঞ্চলিক যোগাযোগ পরিকল্পনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক নীতির মধ্যে জাপান এমন একটি অবস্থান তৈরি করতে চায়, যেখানে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও নিয়মভিত্তিক আঞ্চলিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বজায় থাকে।

২. বিআইজি-বি ও মাতারবাড়ী: লজিস্টিকস ও জ্বালানি কাঠামোর রূপান্তর

বাংলাদেশকে ঘিরে জাপানের পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় উপাদান বিআইজি-বি। এর পুরোনো কাঠামোতে অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নতুন 'শেয়ার্ড প্রসপারিটি' উদ্যোগে ২৭ অক্টোবরের যৌথ বিবৃতিতে চারটি স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. আঞ্চলিক যোগাযোগ ও সংযোগ শক্তিশালী করা;

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলার প্রস্তুতি;

৩. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি ও নিয়মকানুন উন্নত করা;

৪. শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সহযোগিতা।

মাতারবাড়ীর কৌশলগত গুরুত্ব

এই বাস্তবায়নের কেন্দ্রে রয়েছে মাতারবাড়ী-মহেশখালী সমন্বিত দ্বীপ উন্নয়ন প্রকল্প। এতদিন চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের কম গভীরতার কারণে বড় মাদার ভেসেল ভিড়তে পারত না, ফলে শ্রীলঙ্কার কলম্বো বা সিঙ্গাপুর বন্দরে পণ্য খালাস (ট্রান্সশিপমেন্ট) করতে গিয়ে বিপুল অতিরিক্ত খরচ ও সময় অপচয় হতো।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এই সমীকরণ বদলে দিচ্ছে:

- ড্রাফট ও সক্ষমতা: ১৮ মিটারের বেশি প্রাকৃতিক গভীরতা থাকায় সরাসরি 'পোস্ট-প্যানাম্যাক্স' কন্টেইনার জাহাজ ভিড়তে পারবে। এতে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি পরিবহন খরচ ১৫-২০ শতাংশ কমবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য পৌঁছানোর সময় উল্লেখজনকভাবে কমে আসবে।
- জ্বালানি অবকাঠামোর হাব: কন্টেইনার টার্মিনালের পাশাপাশি এলএনজি টার্মিনাল, কয়লা ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং জ্বালানি তেলের মজুতাগার গড়ে তোলার মাধ্যমে এটি ঢাকা-চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলগুলোর প্রধান শক্তি সরবরাহ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে।
- আঞ্চলিক সামুদ্রিক গেটওয়ে: জাপানের কাছে এটি কেবল একটি বন্দর প্রকল্প নয়; এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সাত বোন রাজ্য), নেপাল ও ভুটানের মতো স্থলবেষ্টিত ভূখণ্ডের জন্য সমুদ্রের প্রবেশদ্বার।

তবে কেবল অবকাঠামো বানালেই আঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরি হয় না। বাংলাদেশ যদি শুধু পণ্য পরিবহনের পথ হিসেবে থেকে যায়, তবে প্রাপ্তি সীমিত হবে। এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে কাস্টমস ডিজিটালাইজেশন, বন্দরের চারপাশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) তৈরি এবং স্থানীয় সরবরাহকারী ও জাহাজ মেরামতকারী শিল্পকে এই নেটওয়ার্কে যুক্ত করা আবশ্যক।

৩. উত্তর-পূর্ব ভারত: বাংলাদেশের জন্য সুযোগ, জাপানের জন্য আঞ্চলিক সংযোগ

জাপানের দক্ষিণ এশিয়া পরিকল্পনায় উত্তর-পূর্ব ভারতকে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাপানের সরকারি নথিতে বাংলাদেশ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, নেপাল ও ভুটানকে একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল স্থলবেষ্টিত হওয়ায় সমুদ্রবন্দরে প্রবেশাধিকার তার জন্য অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সেই যোগাযোগ সহজ করে। বাংলাদেশের জন্য এতে তিন ধরনের সুযোগ রয়েছে:

১. বন্দর, সড়ক ও রেল ব্যবহারের ট্রানজিট ও লজিস্টিকস আয়;

২. সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শিল্প ও গুদাম অবকাঠামো গড়ে তোলা;

৩. আঞ্চলিক সরবরাহব্যবস্থায় বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

তবে মূল প্রশ্ন হলো–এই যোগাযোগব্যবস্থায় বাংলাদেশের নিজস্ব বাণিজ্য কতটা বাড়বে? ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার বিপরীতে সমপর্যায়ের বাজারপ্রবেশ, শুল্ক সহযোগিতা ও যৌথ বিনিয়োগ নিশ্চিত না হলে বাংলাদেশ কেবল অন্য দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের করিডরে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

৪. এক ট্রিলিয়ন ইয়েন বিনিয়োগ ও ইপিএ: এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী বাণিজ্য নিরাপত্তা

জাপানের প্রাক্কলিত এক ট্রিলিয়ন ইয়েন (প্রায় ৬.৩৫ বিলিয়ন ডলার) বেসরকারি বিনিয়োগ বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হলো–জমি অধিগ্রহণ ও সরকারি অনুমোদনের বিলম্ব, নীতিগত অনিশ্চয়তা, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের জটিলতা এবং দক্ষ জনবলের ঘাটতি।

বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (EPA)

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত এবং অক্টোবরের শীর্ষ বৈঠকে দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হওয়া ইপিএ (EPA) এই সমস্যা সমাধানের প্রধান আইনি হাতিয়ার। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে বের হয়ে যাবে, তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারে জিএসপি (GSP) বা শুল্কমুক্ত সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। এই প্রেক্ষাপটে ইপিএ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- বাজার প্রবেশাধিকার ও শুল্ক হ্রাস: ইপিএ-র মাধ্যমে জাপানের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য (তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, জুতা, ওষুধ) দীর্ঘমেয়াদে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। বিপরীতে বাংলাদেশ জাপানি ভারী যন্ত্রপাতি, উচ্চপ্রযুক্তি উপাদান ও কাঁচামালের ওপর থেকে ধাপে ধাপে শুল্ক কমাবে।
- বিনিয়োগ ও মেধাস্বত্ব সুরক্ষা: সাধারণ বাণিজ্য চুক্তির (PTA) বাইরে গিয়ে এই ইপিএ-তে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ (FDI), প্রযুক্তি হস্তান্তর, মেধাস্বত্ব এবং আইটি/ইঞ্জিনিয়ারিং সেবার সুরক্ষার স্পষ্ট আইনি কাঠামো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- সরবরাহ শৃঙ্খল বৈচিত্র্যায়ন: 'চীন+১' নীতি অনুসরণকারী জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ইপিএ একটি নিরাপদ ও স্বচ্ছ আইনি কাঠামো দেবে, যা পুঁজি পুনর্বাসনে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো, জাপানি শুল্কমুক্ত সুযোগের পুরো সুফল পেতে পণ্যের মান (TBT), পরিবেশগত মানদণ্ড (ESG) এবং শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৫. টহলজাহাজ ও নিরাপত্তা সহযোগিতা: বহুমুখী ভারসাম্য

অফিসিয়াল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্স (OSA)-এর আওতায় বাংলাদেশকে একটি টহলজাহাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জাপানের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতার নতুন অধ্যায় উন্মোচন করেছে। এর মাধ্যমে উপকূলীয় নজরদারি, মানবপাচার প্রতিরোধ, চোরাচালান বন্ধ এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়বে।

তবে এটি কোনো সামরিক জোট গঠন বা চীনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে না। বাংলাদেশ তার ঐতিহ্যবাহী 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' নীতি বজায় রেখে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে পারে। চীন (প্রধান প্রতিরক্ষা ও অবকাঠামো অংশীদার), ভারত (নিকটতম প্রতিবেশী) এবং যুক্তরাষ্ট্রের (প্রধান রপ্তানি বাজার) ভৌগোলিক বাস্তবতার মধ্যে জাপানি প্রযুক্তি ও বিনিয়োগকে নিজস্ব উন্নয়নে ব্যবহার করাই বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কৌশলগত গুরুত্বকে জাতীয় সক্ষমতায় রূপান্তর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ২০২৬ সালের অক্টোবরের জাপান সফর এবং যৌথ ঘোষণাগুলো বাংলাদেশকে জাপানের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে স্থাপন করেছে।

এই সহযোগিতার চূড়ান্ত সাফল্য কেবল বিনিয়োগের অঙ্কে নির্ধারিত হবে না; নির্ধারিত হবে প্রকৃত কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সুফল কতটা বাংলাদেশে ধরে রাখা গেল তার ওপর। নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও দর-কষাকষির সক্ষমতার মাধ্যমেই বঙ্গোপসাগরকে টেকসই প্রগতির ইঞ্জিনে রূপান্তর করা সম্ভব। ■

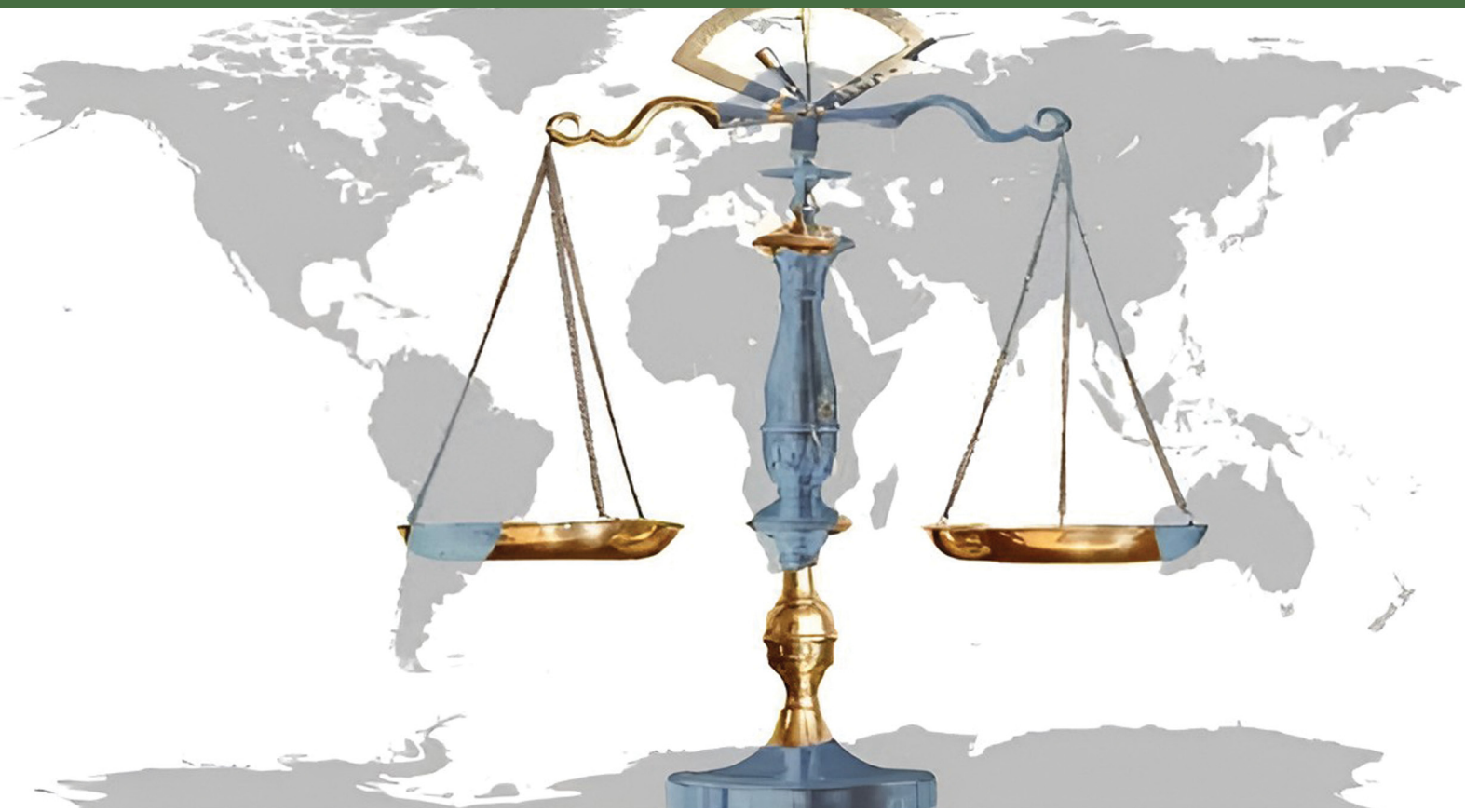

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান ও আইনের শাসন
রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের আলোকে একটি সংস্কার-প্রস্তাব



অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীববিদ্যা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও থিংকট্যাঙ্ক- সিআইপিজির চেয়ারম্যান

সারসংক্ষেপ : *দুর্নীতি কেবল ব্যক্তির নৈতিক বিচ্যুতি নয়; এটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং জবাবদিহির সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি কাঠামোগত সমস্যা। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয়, জনসেবার মানহানি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আস্থার অবক্ষয় ঘটে। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ, স্বাধীন তদন্ত, ন্যায়বিচার, অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধার, সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা, রাজনৈতিক অর্থায়নের জবাবদিহি এবং তথ্যদাতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। টেকসই সংস্কারের লক্ষ্য হবে শুধু অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া নয়; বরং দুর্নীতির সুযোগ, প্রণোদনা ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি দূর করে একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।*

১. ভূমিকা: জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্ষমতার ব্যবহার

রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য কিংবা ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠলে জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত যে সমাজে বহু মানুষ খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণে সংগ্রাম করেন, সেখানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ের উপকরণে পরিণত করা জনগণের অর্পিত আস্থার গুরুতর অপব্যবহার।

করদাতার অর্থ, কৃষকের উৎপাদন, শ্রমিকের শ্রম, প্রবাসীর

পাঠানো রেমিট্যান্স এবং উদ্যোক্তার বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। এসব সম্পদ ব্যবহারের অধিকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হয় জনকল্যাণের জন্য, ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নয়। ফলে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ, স্বার্থের সংঘাত কিংবা প্রভাব খাটিয়ে অনৈতিক সুবিধা অর্জনের ক্ষতি সংশ্লিষ্ট লেনদেনের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ নির্মিত না হওয়া, হাসপাতালে ওষুধের ঘাটতি, সড়ক নির্মাণে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার কিংবা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রকৃত উপকারভোগীর বঞ্চনার পেছনে প্রশাসনিক অদক্ষতা যেমন থাকতে পারে, তেমনি দুর্নীতি ও জবাবদিহির অভাবও ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিটি ব্যর্থতাকে দুর্নীতির ফল বলা যাবে না; তবে সরকারি সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে সরিয়ে নেওয়া হলে জনকল্যাণের ব্যয় বাড়ে এবং রাষ্ট্রের সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিশ্বব্যাংকের শাসনব্যবস্থাসংক্রান্ত গবেষণায় আইনের শাসন, জবাবদিহি, রাষ্ট্রীয় কার্যকারিতা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দুর্নীতি শুধু নৈতিকতার প্রশ্ন নয়; এটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও ন্যায়সংগত সম্পদ বণ্টনেরও প্রশ্ন।

অতএব, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান প্রয়োজন। তবে কঠোরতার অর্থ নির্বিচার গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কিংবা প্রমাণ ছাড়া কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা নয়। এর অর্থ হলো নিরপেক্ষ তদন্ত, কার্যকর বিচার, অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টিকারী ব্যবস্থার সংস্কার। অভিযানের সাফল্য কতজনকে গ্রেপ্তার করা হলো, শুধু তা দিয়ে নয়; বরং ক্ষমতার অপব্যবহার কতটা প্রতিরোধ করা গেল, তা দিয়ে বিচার করতে হবে।

২. দুর্নীতির কাঠামোগত কারণ: ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রণোদনা

দুর্নীতি কেন ঘটে, তা বোঝার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির দুটি ধারণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ–প্রিন্সিপাল-এজেন্ট তত্ত্ব এবং সমষ্টিগত কার্যক্রমের তত্ত্ব।

প্রিন্সিপাল-এজেন্ট তত্ত্ব অনুসারে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্যের পক্ষে দায়িত্ব পালন করলেও তথ্যের অসমতা ও স্বার্থের সংঘাতের কারণে সেই ক্ষমতা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৈধতার উৎস। সরকার, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান জনগণের পক্ষে দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ, ঠিকাদার নির্বাচন, লাইসেন্স অনুমোদন কিংবা সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নাগরিকের পক্ষে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

এই তথ্যগত ব্যবধানের সুযোগে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মনে করেন, অনিয়মের মাধ্যমে অর্জিত লাভ শাস্তির ঝুঁকির চেয়ে বেশি এবং রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রভাব তাঁকে সুরক্ষা দেবে, তাহলে দুর্নীতির প্রণোদনা বাড়ে। এ কারণে শুধু শাস্তির মাত্রা বাড়ানো যথেষ্ট নয়; অনিয়ম শনাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা, তদন্তের নিরপেক্ষতা এবং শাস্তি কার্যকরের নিশ্চয়তাও বাড়াতে হবে।

অন্যদিকে, সমষ্টিগত কার্যক্রমের তত্ত্ব দেখায়, দুর্নীতি যখন দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক আচরণে পরিণত হয়, তখন সৎ থাকা ব্যক্তির জন্যও কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো ব্যবসায়ী যদি মনে করেন, সরকারি চুক্তি পেতে অনৈতিক অর্থ দেওয়া প্রায় অনিবার্য, তাহলে সৎ থাকার কারণে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। নাগরিক যদি বিশ্বাস করেন, ঘুষ ছাড়া ন্যায্য সেবা পাওয়া অসম্ভব, তবে তাঁর আচরণও সেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

এ অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজনকে শাস্তি দিলেই দুর্নীতি বন্ধ হয় না। প্রয়োজন এমন একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা, যেখানে নিয়ম মানলে নাগরিক ও ব্যবসায়ী ন্যায্য সুযোগ পাবেন এবং অনিয়ম করলে প্রভাবশালী ব্যক্তিও জবাবদিহির মুখোমুখি হবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে দুর্নীতি সম্পদ বরাদ্দের দক্ষতা নষ্ট করে। সরকারি অনুমোদন, নিয়োগ, ক্রয় ও উন্নয়ন প্রকল্পে রাজনৈতিক যোগাযোগ বা অনৈতিক সুবিধা যোগ্যতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে দক্ষ উদ্যোক্তা নিরুৎসাহিত হন, অদক্ষ প্রতিষ্ঠান টিকে যায় এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি বাড়ে। দুর্নীতির অর্থনৈতিক ক্ষতি তাই শুধু আত্মসাৎ করা অর্থ নয়; এর মধ্যে রয়েছে নিম্নমানের সেবা, অতিরিক্ত ব্যয়, অনিশ্চয়তা এবং হারানো উন্নয়ন-সুযোগ।

৩. আইনের শাসন ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমতের চাপ সরকারকে দ্রুত দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু গ্রেপ্তার, মামলা কিংবা সম্পদ জব্দের সংখ্যা বাড়ানো আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এক বিষয় নয়।

আইনের শাসনের মৌলিক শর্ত হলো–রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে, আইন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে এবং বিচারপ্রক্রিয়া স্বাধীন ও ন্যায্য হবে। কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বলে দায়মুক্তি পাবেন না; আবার রাজনৈতিক বিরোধী হওয়ার কারণে প্রমাণ ছাড়াই শাস্তির শিকারও হবেন না।

দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে চারটি নীতি বিশেষভাবে জরুরি। প্রথমত, আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান বা সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আমলা, পুলিশ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী কিংবা ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি–কারও পরিচয় তদন্ত বন্ধের কারণ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, নির্দোষিতার অনুমান ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার বজায় রাখতে হবে। অভিযোগ, প্রাথমিক অনুসন্ধান, আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র এবং আদালতে অপরাধ প্রমাণ–এগুলো পৃথক আইনি পর্যায়।

তৃতীয়ত, তদন্ত হতে হবে স্বাধীন ও পেশাদার। সম্পদের উৎস, ব্যাংক লেনদেন, কর নথি, সরকারি চুক্তি, প্রকৃত মালিকানা এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণের জন্য বিশেষায়িত দক্ষতা প্রয়োজন। চতুর্থত, অপরাধ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং তদন্ত ও সম্পদ জব্দের সিদ্ধান্ত যথাযথ আইনি পর্যালোচনার আওতায়

রাখতে হবে।

জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC) দুর্নীতি প্রতিরোধ, অপরাধীকরণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের একটি সমন্বিত কাঠামো দিয়েছে। দুর্নীতির অর্থপ্রবাহ অনেক সময় দেশের সীমানা অতিক্রম করে বলে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারিত হয় ক্ষমতাসীনদের নিজেদের বলয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা নেয়, তা দিয়ে। সরকার যদি বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়, অথচ নিজের সমর্থক বা ঘনিষ্ঠদের ক্ষেত্রে নীরব থাকে, তাহলে অভিযান রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এতে তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা কমে এবং দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে দায়মুক্তির সুযোগ তৈরি হয়।

এ জন্য তদন্ত শুরুর মানদ-, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের নথি, তদন্তের অগ্রগতি এবং বেআইনি হস্তক্ষেপের অভিযোগ পর্যালোচনার ব্যবস্থা স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। সরকারি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সম্পদ বিবরণীও নিয়মিত যাচাই করতে হবে। ঘোষিত সম্পদের সঙ্গে আয়, ঋণ, কর পরিশোধ, পারিবারিক মালিকানা ও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক পরীক্ষা করা জরুরি। অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি তদন্তের সূত্র হতে পারে, কিন্তু সেটিই অপরাধের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়।

৪. অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধার: অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের অপরিহার্য শর্ত

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াইয়ের অন্যতম লক্ষ্য হলো অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ শনাক্ত, জব্দ, বাজেয়াপ্ত এবং আইন অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা। শুধু কারাদ-ের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে দুর্নীতির অর্থনৈতিক প্রণোদনা দূর করা সম্ভব নয়। আত্মসাৎ করা অর্থ বা তার বিনিয়োগ থেকে অর্জিত সম্পদ অপরাধীর নিয়ন্ত্রণে থেকে গেলে শাস্তির প্রতিরোধমূলক প্রভাব সীমিত হতে পারে।

তবে সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াও আইনের শাসনের অধীন হতে হবে। বিদেশে বাড়ি, ব্যাংক হিসাব বা ব্যবসায়িক বিনিয়োগ থাকলেই তা অবৈধ বলে ধরে নেওয়া যাবে না। সম্পদের বৈধ উৎস, কর পরিশোধ, অর্থ স্থানান্তরের নথি, প্রকৃত মালিকানা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের সঙ্গে সম্পদের যোগসূত্র যাচাই করতে হবে।

এ প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আয়কর বিবরণী, ব্যাংক লেনদেন, কোম্পানির মালিকানা, ভূমি নিবন্ধন, সরকারি চুক্তি এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের মধ্যে অসংগতি খুঁজে সম্পদের উৎস শনাক্ত করতে হবে। আর্থিক গোয়েন্দা বিশ্লেষণ, নিরীক্ষা ও ডিজিটাল তথ্যের সমন্বিত ব্যবহার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, সম্পদ গোপন বা স্থানান্তর প্রতিরোধ করতে হবে। আইনের নির্ধারিত শর্ত পূরণ হলে আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সাময়িকভাবে সম্পদ জব্দ কিংবা লেনদেন সীমিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা, আনুপাতিকতা, নোটিশ এবং প্রতিকারের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, বিদেশে পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে আন্তর্জাতিক আইনি সহযোগিতা, নথি বিনিময়, প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিকানা শনাক্তকরণ এবং আদালতসম্মত প্রক্রিয়া প্রয়োজন। এ কাজে সাফল্য নির্ভর করে প্রমাণের মান, আইনি প্রস্তুতি ও সংশ্লিষ্ট দেশের সহযোগিতার ওপর।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ গৃহীত A/RES/79/190 প্রস্তাবে দুর্নীতির অর্থ স্থানান্তর প্রতিরোধ এবং বৈধ মালিকের কাছে সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া রক্ষা ও সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার অপব্যবহার প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত।

সম্পদ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ হিসাব প্রকাশ করা জরুরি। কত সম্পদ শনাক্ত হয়েছে, কত সাময়িকভাবে জব্দ, কত চূড়ান্তভাবে বাজেয়াপ্ত এবং কত বাস্তবে রাষ্ট্রের কাছে ফিরেছে–এসব আলাদাভাবে জানাতে হবে। জব্দ করা সম্পদকে উদ্ধার করা সম্পদ হিসেবে দেখানো যাবে না। উদ্ধার করা অর্থ কোথায় ব্যয় হয়েছে, সেটিও প্রকাশ করতে হবে, যাতে জনসম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া নতুন অস্বচ্ছতার উৎস না হয়।

৫. সরকারি ক্রয়, জনসেবা ও রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা

দুর্নীতির কাঠামোগত উৎস মোকাবিলায় সরকারি ক্রয় ও উন্নয়ন প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকল্পের প্রয়োজন নির্ধারণ, ব্যয় প্রাক্কলন, দরপত্র, ঠিকাদার নির্বাচন, চুক্তি সংশোধন, কাজের মান যাচাই এবং বিল পরিশোধ–প্রতিটি পর্যায়ে অনিয়মের ঝুঁকি থাকতে পারে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) সরকারি ক্রয়কে অপচয়, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ঝুঁকি কমাতে দরপত্র, মূল্যায়ন, চুক্তি, সংশোধনী ও বাস্তবায়নের তথ্য সহজে অনুসন্ধানযোগ্যভাবে প্রকাশ করতে হবে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিকানা শনাক্ত করা, অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি পর্যালোচনা, কাজের অগ্রগতির সঙ্গে অর্থ পরিশোধের সম্পর্ক নিশ্চিত করা এবং স্বাধীন নিরীক্ষার ফল প্রকাশ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির (BPPA) ই-জিপি ব্যবস্থা সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন পর্যায় ডিজিটালভাবে পরিচালনার সুযোগ তৈরি করেছে। দরপত্র আহ্বান, জমা, মূল্যায়ন, চুক্তি প্রদান ও ব্যবস্থাপনার নথি ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত হলে সিদ্ধান্তের ইতিহাস অনুসরণ সহজ হয় এবং তথ্যের প্রবেশাধিকার বাড়ে।

তবে ডিজিটাল দরপত্র চালু হওয়াই দুর্নীতি দূর হওয়ার প্রমাণ নয়। দরপত্রের শর্ত নির্ধারণ, প্রতিযোগিতা সীমিত করা, চুক্তি সংশোধন, কাজের মান যাচাই কিংবা বিল পরিশোধের পর্যায়েও অনিয়ম হতে পারে। একই প্রতিষ্ঠান বারবার চুক্তি পাওয়া, দরপত্রে কম প্রতিযোগিতা, অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি বা বারবার চুক্তি সংশোধনের মতো বিষয় ঝুঁকিভিত্তিক পর্যালোচনার সূচনা হতে পারে। এগুলো সরাসরি দুর্নীতির প্রমাণ নয়; প্রতিটি ক্ষেত্রে নথি ও ব্যাখ্যা যাচাই করতে হবে।

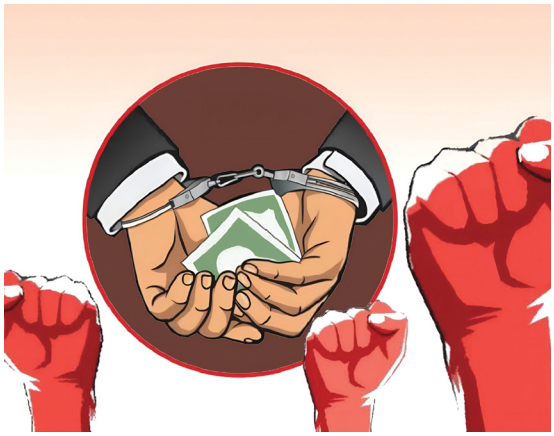

জনসেবার ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা অপরিহার্য। ভূমি নিবন্ধন, পুলিশি সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, লাইসেন্স এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নাগরিকের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরতা বেশি। নিয়ম অস্পষ্ট, সেবার সময়সীমা অনির্দিষ্ট এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা দুর্বল হলে অনানুষ্ঠানিক অর্থ লেনদেনের সুযোগ বাড়ে।

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সেবার নির্ধারিত ফি, প্রয়োজনীয় নথি, সময়সীমা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং অভিযোগ বা আপিলের পদ্ধতি প্রকাশ করতে হবে। ডিজিটাল সেবা মধ্যস্থতাকারীর অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব কমাতে পারে; তবে তথ্য সুরক্ষা, সিদ্ধান্ত যাচাই এবং প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার প্রতিকার নিশ্চিত না হলে দুর্নীতি অন্য রূপে চলতে পারে।

রাজনৈতিক অর্থায়নও জবাবদিহির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। নির্বাচনী ব্যয়, দলীয় অর্থের উৎস, ব্যবসায়িক স্বার্থ ও সরকারি সিদ্ধান্তের মধ্যে অস্বচ্ছ সম্পর্ক তৈরি হলে নীতিনির্ধারণে বিশেষ গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়তে পারে। প্রতিটি রাজনৈতিক অনুদানকে দুর্নীতির প্রমাণ হিসেবে দেখা ঠিক নয়; তবে অনুদানের উৎস গোপন রাখা, সরকারি সুবিধার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ কিংবা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তকে অর্থদাতার স্বার্থে ব্যবহার করার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আয়-ব্যয়ের নিয়মিত প্রকাশ, স্বাধীন নিরীক্ষা, স্বার্থের সংঘাতের ঘোষণা এবং সরকারি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ব্যবসায়িক স্বার্থ যাচাই এ ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে।

৬. স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিকতা ও তথ্যদাতার সুরক্ষা

দুর্নীতি শনাক্ত ও বিচারের জন্য আইন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন স্বাধীন, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান। দুর্নীতি দমন কমিশন, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ, প্রসিকিউশন ও আদালতের দায়িত্ব পৃথক হলেও তাদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় থাকতে হবে।

দুর্নীতি দমনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা মানে জবাবদিহিহীন ক্ষমতা নয়। তদন্তের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক নির্দেশ, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা কিংবা বেআইনি চাপের পরিবর্তে আইন ও প্রমাণের ভিত্তিতে নিতে হবে। একই সঙ্গে তদন্তকারীর অসদাচরণ, তথ্যের অপব্যবহার, অযৌক্তিক বিলম্ব ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিকার থাকতে হবে।

স্বচ্ছ নিয়োগপ্রক্রিয়া, দক্ষ জনবল, পর্যাপ্ত বাজেট, পেশাগত প্রশিক্ষণ, তদন্তের নথি সংরক্ষণ, স্বাধীন নিরীক্ষা এবং অভিযোগের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির নির্দিষ্ট অপরাধ অনুসন্ধান-তদন্তের আইনি ভিত্তি দিয়েছে। কিন্তু আইনে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বাস্তবে স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতা এক নয়। নিয়োগপ্রক্রিয়া, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, আর্থিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের ব্যবস্থার ওপর প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভর করে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ২০২৩ সালের UNCAC-সংক্রান্ত নাগরিক সমাজের পর্যালোচনাও দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সম্পদ পুনরুদ্ধারে আইনগত কাঠামোর পাশাপাশি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা বিবেচনার প্রয়োজন তুলে ধরে। তাই কমিশনের কার্যকারিতা শুধু মামলা বা গ্রেপ্তারের সংখ্যা দিয়ে নয়; তদন্তের মান, বিচারিক ফলাফল, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ নিষ্পত্তির ভিত্তিতেও মূল্যায়ন করতে হবে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও তথ্যদাতার সুরক্ষা দুর্নীতি শনাক্ত করার অপরিহার্য উপাদান। সরকারি নথি, চুক্তি, সম্পদ বিবরণী কিংবা আর্থিক লেনদেনের তথ্য প্রকাশ্যে না এলে বহু অনিয়ম শনাক্ত করা কঠিন। জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশের কারণে সাংবাদিক, কর্মকর্তা বা নাগরিক চাকরি হারানো, ভয়ভীতি, মামলা কিংবা প্রতিশোধের আশঙ্কায় থাকলে দুর্নীতির তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা কমে যায়।

তাই তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা, প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিকার এবং নিরাপদ অভিযোগের মাধ্যম নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা অভিযোগ, ব্যক্তিগত তথ্যের বেআইনি প্রকাশ ও যাচাইহীন প্রচারণা প্রতিরোধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা প্রয়োজন। সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব হলো অভিযোগ, প্রমাণ, তদন্তের অগ্রগতি এবং বিচারিক ফলাফল পৃথকভাবে উপস্থাপন করা।

৭. দুর্নীতি, বৈষম্য ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার

দুর্নীতির বোঝা সমাজে সমানভাবে বণ্টিত হয় না। উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতিতে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ হতে পারে; অন্যদিকে দৈনন্দিন প্রশাসনিক দুর্নীতি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারকে বারবার অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য করে।

একটি দরিদ্র পরিবারকে চিকিৎসা, ভূমিসেবা বা সামাজিক সহায়তা পেতে অনানুষ্ঠানিক অর্থ দিতে হলে খাদ্য, শিক্ষা ও সঞ্চয়ের ব্যয় কমাতে হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে লাইসেন্স বা অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারি প্রকল্পে নিম্নমানের কাজ হলে ভবিষ্যতে মেরামতের ব্যয় বাড়ে এবং জনগণ একই অবকাঠামোর জন্য একাধিকবার অর্থনৈতিক মূল্য দেয়।

তবে দুর্নীতি দমন করলেই মূল্যস্ফীতি অবিলম্বে কমে যাবে–এমন দাবি যথার্থ নয়। পণ্যমূল্য উৎপাদন ব্যয়,

আমদানি, বিনিময় হার, জ্বালানি, পরিবহন, সরবরাহব্যবস্থা ও বাজারের প্রতিযোগিতাসহ বহু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। দুর্নীতি দমন অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও অনৈতিক প্রতিবন্ধকতা কমাতে পারে; কিন্তু মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর বাজার তদারকিও প্রয়োজন।

দুর্নীতিবিরোধী নীতিকে তাই সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনসেবার মানোন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কত অর্থ উদ্ধার হয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সেই অর্থ জনস্বার্থে কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

৮. সংস্কারের রূপরেখা ও সাফল্য পরিমাপ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে এককালীন অভিযান দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে না। প্রয়োজন পর্যায়ভিত্তিক, পরিমাপযোগ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচি।

প্রথম পর্যায়: তদন্ত ও জবাবদিহির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা। সরকারি ক্রয়, বড় উন্নয়ন প্রকল্প, ভূমি প্রশাসন, কর ও শুল্ক, ব্যাংকিং-সংশ্লিষ্ট সরকারি সিদ্ধান্ত এবং জনসেবায় অনানুষ্ঠানিক লেনদেনের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণ, প্রাথমিক যাচাই, তদন্ত শুরু, সম্পদ জব্দ ও মামলা দায়েরের জন্য স্বচ্ছ আইনি মানদ- নির্ধারণ জরুরি।

দ্বিতীয় পর্যায়: আর্থিক স্বচ্ছতা ও সম্পদ অনুসন্ধান। সরকারি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সম্পদ বিবরণী যাচাই, প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিকানা শনাক্তকরণ, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণ এবং আইনসম্মতভাবে কর ও সম্পদ-সংক্রান্ত তথ্যের সমন্বয় বাড়াতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়: জনসেবা ও সরকারি ক্রয়ব্যবস্থার সংস্কার। পরিকল্পনা, বরাদ্দ, দরপত্র, চুক্তি, বাস্তবায়ন, নিরীক্ষা ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন–সরকারি ব্যয়ের পুরো চক্র যথাসম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে। জনসেবায় নির্ধারিত ফি, সময়সীমা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করতে হবে।

চতুর্থ পর্যায়: রাজনৈতিক ও সামাজিক জবাবদিহি। রাজনৈতিক অর্থায়নের স্বচ্ছতা, তথ্য অধিকার, স্বাধীন নিরীক্ষা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং তথ্যদাতার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ব্যয় এবং জনসেবার মান পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিতে হবে।

প্রতিটি সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, সময়সীমা, পরিমাপযোগ্য সূচক ও স্বাধীন মূল্যায়নের ব্যবস্থা যুক্ত করা প্রয়োজন। শুধু নতুন আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়; জনবল, বাজেট, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

সাফল্য মূল্যায়নে গ্রেপ্তার, মামলা কিংবা সংবাদ সম্মেলনের সংখ্যা নয়, ফলাফলকে গুরুত্ব দিতে হবে। কত অভিযোগ যাচাই হয়েছে, কত মামলায় নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, কতটির বিচার সম্পন্ন হয়েছে এবং কত ক্ষেত্রে আইনসম্মত শাস্তি কার্যকর হয়েছে–এসব তথ্য আলাদাভাবে প্রকাশ করা উচিত।

একইভাবে শনাক্ত, সাময়িকভাবে জব্দ, চূড়ান্তভাবে বাজেয়াপ্ত এবং বাস্তবে ফেরত পাওয়া সম্পদের হিসাব পৃথক রাখতে হবে। জনসেবায় গড় সময়, নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার অভিযোগ, অভিযোগ নিষ্পত্তির হার, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও কাজের মানও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নাগরিকের আস্থা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশের পরিবর্তন মূল্যায়নের পাশাপাশি নাগরিক অধিকার, তদন্তের নিরপেক্ষতা ও বিচারিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকছে কি না, সেটিও বিবেচনায় নিতে হবে।

উপসংহার: জনগণের সম্পদ রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান কোনো সাময়িক রাজনৈতিক স্লোগান কিংবা প্রতিহিংসার হাতিয়ার হতে পারে না। এটি একটি কার্যকর, ন্যায়ভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত। শুধু অপরাধী শনাক্ত ও শাস্তি দেওয়ার মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখলে স্থায়ী ফল পাওয়া কঠিন। দুর্নীতি যেখানে প্রশাসনিক বিবেচনাধিকার, অস্বচ্ছ অর্থপ্রবাহ, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও দুর্বল জবাবদিহির মাধ্যমে পুনরুৎপাদিত হয়, সেখানে ব্যক্তির বিচারকে ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ শুধু দৃশ্যমান অভিযান পরিচালনা নয়; বরং এমন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে আইন ভাঙার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় বা সামাজিক অবস্থানের কারণে কেউ সুবিধা পাবেন না, সরকারি অর্থের ব্যবহার যাচাইযোগ্য হবে এবং নাগরিককে ন্যায্য সেবা পেতে অনৈতিক অর্থ দিতে হবে না।

এর জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ, স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান, দক্ষ আর্থিক তদন্ত, অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধার, স্বচ্ছ সরকারি ক্রয়, রাজনৈতিক অর্থায়নের জবাবদিহি এবং নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার। একই সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রক্ষা করতে হবে, যাতে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ নিজেই ক্ষমতার অপব্যবহারের নতুন উৎসে পরিণত না হয়।

সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের বাস্তব অর্থ কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধি নয়। এর অর্থ এমন একটি সমাজ নির্মাণ, যেখানে দরিদ্র মানুষ ন্যায়সংগত সেবা পাবেন, তরুণেরা যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ পাবেন, উদ্যোক্তারা ন্যায্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনকল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

সরকারের প্রতি তাই আহ্বান–দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়, ধারাবাহিক ও নিরপেক্ষ অভিযান পরিচালনা করুন। নিজের বলয় কিংবা বিরোধী পক্ষ–কারও জন্য পৃথক মানদ- তৈরি করবেন না। প্রমাণিত অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করুন, জনগণের সম্পদ ফিরিয়ে আনুন এবং দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার করুন।

রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি কতজন ক্ষমতাবানকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, শুধু তার মধ্যে নিহিত নয়; বরং ক্ষমতাবান ব্যক্তিও আইন ভাঙলে জবাবদিহির মুখোমুখি হবেন–এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তার প্রকৃত শক্তি নিহিত। জনগণের সম্পদ রক্ষা ও আইনের সমান প্রয়োগ কোনো রাজনৈতিক অনুগ্রহ নয়; এটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব, গণতান্ত্রিক বৈধতার ভিত্তি এবং ন্যায়বিচারের অপরিহার্য শর্ত।



তথ্যের যুগে স্মৃতির সঙ্কট



মুহাম্মদ খায়রুল বাশার
সিনিয়র সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক

ডিজিটাল বিপ্লব মানুষের যোগাযোগ, স্মৃতিশক্তি, শিক্ষা, তথ্য গ্রহণ এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে গভীরভাবে বদলে দিয়েছে। স্মার্টফোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, সার্চ ইঞ্জিন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিপুল পরিমাণ তথ্য মানুষের হাতের নাগালে এনে দিয়েছে। এর ফলে তথ্য খুঁজে পাওয়ার সক্ষমতা যেমন বহুগুণ বেড়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তথ্য মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা কমেছে। প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব সুবিধার পাশাপাশি তাই তৈরি হয়েছে নতুন এক জ্ঞানীয় চ্যালেঞ্জ– মানুষ কি ক্রমেই নিজের স্মৃতি, মনোযোগ ও বিশ্লেষণক্ষমতার একটি অংশ যন্ত্রের কাছে অর্পণ করে ফেলছে?

এই প্রেক্ষাপটে 'ডিজিটাল ডিমেনশিয়া' কথাটি আলোচনায় এসেছে। এটি কোনো স্বীকৃত চিকিৎসাগত বা স্নায়ুবৈজ্ঞানিক রোগের নাম নয়; বরং অতিরিক্ত ডিজিটাল নির্ভরতার সম্ভাব্য জ্ঞানীয় প্রভাব বোঝাতে ব্যবহৃত একটি ধারণাগত শব্দ। জার্মান স্নায়ুবিজ্ঞানী ম্যানফ্রেড স্পিৎজার তার Digital Dementia বইয়ের মাধ্যমে শব্দটিকে ব্যাপক পরিচিতি দেন। তার যুক্তির কেন্দ্রবিন্দু হলো– মানুষ যখন নিয়মিতভাবে স্মৃতি, মনোযোগ, হিসাব, দিকনির্দেশনা কিংবা তথ্য বিশ্লেষণের মতো কাজ প্রযুক্তির ওপর ছেড়ে দেয়, তখন এসব মানসিক দক্ষতার চর্চা কমে যেতে পারে।

তবে বিষয়টিকে প্রযুক্তিবিরোধী অবস্থান থেকে দেখলে সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষের সক্ষমতা কমানোর পাশাপাশি বহু ক্ষেত্রে তা বাড়িয়েছে। প্রশ্ন তাই প্রযুক্তি থাকবে কি থাকবে না– এটি নয়; প্রশ্ন হলো, প্রযুক্তি ব্যবহারের ধরন এমন হচ্ছে কি না, যেখানে মানুষের নিজস্ব চিন্তা, বিচারবোধ ও সৃজনশীলতার জায়গাটি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

স্মৃতির সঙ্কট

একসময় মানুষের স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ফোন নম্বর,

ঠিকানা, পথঘাট, গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, বইয়ের তথ্য কিংবা প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান। এখন স্মার্টফোনের কনট্যাক্ট লিস্ট, ক্যালেন্ডার, সার্চইঞ্জিন, ক্লাউড স্টোরেজ ও এআই সহযোগিতা এসব কাজের বড় অংশ করে দিচ্ছে। এতে মানুষের জীবন সহজ হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে একটি প্রশ্নও এসেছে– যে কাজগুলো মানুষ আর নিজে করে না, সেগুলোর দক্ষতা কি দীর্ঘমেয়াদে দুর্বল হতে পারে?

এখানে 'বাহ্যিক স্মৃতি'-এর ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। গুগল, উইকিপিডিয়া, ডিজিটাল আর্কাইভ কিংবা এআই-এর কাছে তথ্য পাওয়া এখন এত সহজ যে মানুষ অনেক সময় তথ্যটি মনে রাখার চেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে সেটি মনে রাখাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এটি সবসময় ক্ষতিকর নয়। কিন্তু শেখার ক্ষেত্রে যদি তথ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক তৈরি না হয়ে শুধু দ্রুত পুনরুদ্ধারের অভ্যাস তৈরি হয়, তাহলে জ্ঞান অর্জন এবং তথ্য সংগ্রহের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়।

মিডিয়া ব্যবহারে বড় পরিবর্তন

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে দৃশ্যমান ক্ষেত্রগুলোর একটি হলো গণমাধ্যম। সংবাদপত্রের দীর্ঘ প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, বিশ্লেষণ কিংবা বই পড়ে তথ্য বোঝার বদলে বিপুলসংখ্যক মানুষ এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নিউজফিড, শর্ট ভিডিও, রিল, নোটিফিকেশন এবং কয়েক লাইনের সারাংশের মাধ্যমে সংবাদ গ্রহণ করছে।

একটি খবরের শিরোনাম পড়ে, ভিডিওর প্রথম কয়েক সেকেন্ড দেখে অথবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কোনো পোস্টের কয়েকটি বাক্য পড়েই অনেকেই মনে করছেন, পুরো বিষয়টি তারা জেনে গেছেন। অথচ একটি ঘটনার পটভূমি, পরস্পরবিরোধী তথ্য, প্রেক্ষাপট, পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য বুঝতে সময় লাগে। দ্রুততার এই সংস্কৃতি সংবাদভোগকে সহজ করেছে, কিন্তু গভীর পাঠের অভ্যাসকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

মিডিয়ার জন্য এখানেই নতুন দায়িত্ব তৈরি হয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে এখন শুধু সংবাদ প্রকাশ করলেই হচ্ছে না; পাঠককে তথ্যের প্রেক্ষাপটও দিতে হচ্ছে। কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম সাধারণত ব্যবহারকারীর মনোযোগ ধরে রাখাকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে উত্তেজক, আবেগনির্ভর, সংক্ষিপ্ত বা বিতর্কিত কনটেন্ট অনেক সময় দীর্ঘ ও তথ্যনির্ভর প্রতিবেদনের চেয়ে বেশি দৃশ্যমানতা পেতে পারে।

এটি শুধু পাঠকের মনোযোগের সমস্যা নয়; এটি গণমাধ্যমের ব্যবসায়িক কাঠামোর সঙ্গেও যুক্ত। ক্লিক, ভিউ, শেয়ার, কমেন্ট এবং দেখার সময় যখন ডিজিটাল মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সূচকে পরিণত হয়, তখন 'মনোযোগ অর্থনীতি' সংবাদ উৎপাদন ও উপস্থাপনার ধরনেও প্রভাব ফেলে। ফলে সাংবাদিকতার সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন দাঁড়ায়– মানুষের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য সংবাদকে কতটা সংক্ষিপ্ত করা যাবে, আর কোথা থেকে শুরু হবে তথ্যের অতিসরলীকরণ?

অ্যালগরিদম কি আমাদের হয়ে চিন্তা করছে?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো– আগে মানুষ নিজের পছন্দের সংবাদ বেছে নিত; এখন অনেক ক্ষেত্রে অ্যালগরিদম মানুষের সামনে সংবাদ বেছে দেয়। ব্যবহারকারী কী পড়েছেন, কোন ভিডিও কতক্ষণ দেখেছেন, কিসে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন– এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে প্ল্যাটফর্মগুলো পরবর্তী কনটেন্ট সাজায়।

এর ফলে মানুষ এমন একটি তথ্যপরিবেশে আটকে যেতে পারেন, যেখানে তার পূর্ববর্তী ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যই বারবার সামনে আসে। এতে তথ্যের বৈচিত্র্য কমতে পারে এবং নিশ্চিতকরণ পক্ষপাত বাড়তে পারে। একই সঙ্গে ভুল তথ্য, অপতথ্য ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্টও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

তাই ডিজিটাল যুগে শুধু 'তথ্য জানা' যথেষ্ট নয়; কোন তথ্য বিশ্বাসযোগ্য, কোনটি অসম্পূর্ণ, কোনটি মতামত এবং কোনটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা– তা শনাক্ত করার সক্ষমতাও জরুরি। এখানেই মিডিয়া লিটারেসি বা গণমাধ্যম-সাক্ষরতার গুরুত্ব।

মনোযোগের ওপর চাপ

ডিজিটাল ডিমেনশিয়ার আলোচনায় মনোযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নোটিফিকেশন, রিল, শর্ট ভিডিও, দ্রুত স্ক্রলিং এবং একাধিক অ্যাপের মধ্যে বারবার যাতায়াত মানুষের মনোযোগকে খণ্ডিত করতে পারে। মানুষ মনে করতে পারে সে একই সঙ্গে কয়েকটি কাজ করছে; বাস্তবে মস্তিষ্ককে বারবার এক কাজ থেকে অন্য কাজে সুইচ করতে হয়।

এর প্রভাব সংবাদ পাঠেও দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘ প্রতিবেদন পড়ার বদলে অনেকে শিরোনাম, বুলেট পয়েন্ট কিংবা ভিডিও সারাংশে সীমাবদ্ধ থাকতে চান। এতে দ্রুত তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু জটিল বিষয় বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্য ও মনোযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সাংবাদিকতার জন্য এর তাৎপর্য গভীর। গণমাধ্যমের অন্যতম কাজ শুধু মানুষকে তথ্য দেওয়া নয়; নাগরিককে এমন তথ্য দেওয়া, যার ভিত্তিতে সে বিষয়টি বুঝতে ও বিচার করতে পারে। অতিরিক্ত সংক্ষিপ্তকরণ যদি সেই বোঝার প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে সংবাদ তার সামাজিক ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারাতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন প্রশ্ন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তারের ফলে বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে। এআই কয়েক সেকেন্ডে প্রতিবেদন, সারাংশ, অনুবাদ, বিশ্লেষণ, ছবি কিংবা তথ্যের খসড়া তৈরি করতে পারে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এটি গবেষণা, ডাটা বিশ্লেষণ, ট্রান্সক্রিপশন ও সম্পাদনার কাজে বড় সহায়ক হতে পারে।

কিন্তু এখানেও একটি ভারসাম্যের প্রশ্ন আছে। সাংবাদিক যদি নিজে তথ্য যাচাই না করে এআই-নির্ভর সারাংশের ওপর নির্ভর করেন, তাহলে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য পুনরুৎপাদনের ঝুঁকি থাকে। একইভাবে পাঠক যদি মূল প্রতিবেদন না পড়ে শুধু এআই- তৈরি সার-সংক্ষেপ-এর ওপর নির্ভর করেন,

তাহলে তিনি তথ্যের পাশাপাশি প্রেক্ষাপটও হারাতে পারেন।

সুতরাং এআই সাংবাদিকের বিকল্প নয়; বরং সাংবাদিকের সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি উপকরণ হওয়া উচিত। তথ্যের উৎস যাচাই, পক্ষগুলোর বক্তব্য গ্রহণ, প্রেক্ষাপট বোঝা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দায়িত্ব মানুষেরই থাকা প্রয়োজন।

জিপিএস, ক্যালকুলেটর ও দৈনন্দিন দক্ষতা

দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। জিপিএস মানুষের চলাচল সহজ করেছে। কিন্তু সবসময় ডিজিটাল নেভিগেশনের ওপর নির্ভর করলে নিজের চারপাশের ভৌগোলিক ধারণা বা পথ মনে রাখার প্রয়োজন কমে যায়।

গণিতের ক্ষেত্রেও ক্যালকুলেটর একইভাবে মানুষের সময় বাঁচায়। কিন্তু মৌলিক হিসাবের সক্ষমতা পুরোপুরি যন্ত্রের ওপর ছেড়ে দিলে মানসিক গণনার চর্চা কমতে পারে। জেনারেটিভ AI লেখালেখি, গবেষণা ও সৃজনশীল কাজকে সহজ করছে; কিন্তু নিজের ভাষায় চিন্তা করা, যুক্তি সাজানো ও সমস্যা সমাধানের অনুশীলন যদি কমে যায়, তাহলে প্রযুক্তি সহায়ক থেকে নির্ভরতার জায়গায় চলে যেতে পারে।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মস্তিষ্ক ও আচরণগত দক্ষতা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অতিরিক্ত স্ক্রিন-নির্ভরতা বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ, খেলাধুলা, বই পড়া, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের জায়গা দখল করলে তা নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে।

এখানে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার দায়িত্ব সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে শুধু 'মোবাইল ব্যবহার করো না' বললে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং তাকে বই, খেলাধুলা, প্রকৃতি, শিল্প, আলোচনা ও মুখোমুখি সামাজিক যোগাযোগের বিকল্প আনন্দ দিতে হবে।

গণতন্ত্র ও জনমত গঠনের প্রশ্ন

ডিজিটাল নির্ভরতার প্রভাব ব্যক্তিগত জীবন ছাড়িয়ে গণতান্ত্রিক সমাজেও পৌঁছায়। নাগরিক যদি দীর্ঘ প্রতিবেদন, নীতিগত বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্যের পরিবর্তে কেবল অ্যালগরিদম-নির্বাচিত ছোট কনটেন্টের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেন, তাহলে জনমত গঠনের প্রক্রিয়া আরও আবেগনির্ভর ও খণ্ডিত হতে পারে।

এখানে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকতার কাজ কেবল ভাইরাল কনটেন্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা নয়; বরং যাচাই করা তথ্য, প্রেক্ষাপট, ভিন্নমত এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

ডিজিটাল যুগে একটি শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম তাই একই সাথে দুই ধরনের কাজ করবে– দ্রুত সংবাদ দেবে এবং গভীর সংবাদও দেবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা থাকবে, কিন্তু তার সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, তথ্যের উৎস এবং প্রেক্ষাপটে যাওয়ার সুযোগও থাকতে হবে। এভাবেই দ্রুততার সঙ্গে গভীরতার ভারসাম্য তৈরি করা সম্ভব।

সমাধান প্রযুক্তি বর্জন নয়

অতএব সমাধান প্রযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা নয়; বরং প্রযুক্তি ব্যবহারে শৃঙ্খলা তৈরি করা। প্রতিটি বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মতো ডিজিটাল বিপ্লবের সঙ্গেও সমাজকে নতুন ব্যবহারিক ও নৈতিক অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল গবেষণার পাশাপাশি বই পড়া, ক্যালকুলেটরের পাশাপাশি মানসিক হিসাব এবং এআই ব্যবহারের পাশাপাশি নিজস্ব বিশ্লেষণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। পরিবারে ডিভাইসমুক্ত খাবারের সময়, নির্দিষ্ট স্ক্রিন-সময়সীমা এবং নিয়মিত বাইরের কার্যক্রমের অভ্যাস তৈরি করা যেতে পারে।

মিডিয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন 'ডিজিটাল সংযম'। পাঠককে শুধু দ্রুত ক্লিক করানোর পরিবর্তে তাকে পড়তে, ভাবতে এবং যাচাই করতে উৎসাহিত করতে হবে। সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইট ও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে সংক্ষিপ্ত কনটেন্ট প্রয়োজন হলেও সেই কনটেন্ট যেন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের বিকল্প না হয়ে প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে– এটি নিশ্চিত করা জরুরি।

প্রযুক্তি মানুষের সহায়ক, বিকল্প নয়

ডিজিটাল ডিমেনশিয়া কোনো চিকিৎসাগত রোগের নাম নয়; বরং প্রযুক্তির অতিনির্ভরতার সম্ভাব্য জ্ঞানীয় ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে সতর্ক হওয়ার একটি ধারণা। প্রযুক্তি মানুষের শত্রু নয়। বরং সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে এটি শিক্ষা, গবেষণা, সাংবাদিকতা, যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়াতে পারে।

প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো– প্রযুক্তি আমাদের কতটা কাজ করে দিচ্ছে তা নয়; বরং সেই সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি আমরা নিজেদের কতটা চিন্তা করতে, মনে রাখতে, পড়তে, প্রশ্ন করতে এবং যাচাই করতে সক্ষম থাকছি।

বিশেষ করে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংবাদ শুধু তথ্য সরবরাহ করে না; একটি সমাজ কিভাবে বাস্তবতাকে বুঝবে, সে কাঠামোও তৈরিতে ভূমিকা রাখে। অ্যালগরিদম যদি মানুষের মনোযোগ নির্ধারণ করে, এআই যদি তথ্যের সারাংশ তৈরি করে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যদি জনমতের বড় অংশের প্রবেশদ্বার হয়ে ওঠে, তাহলে স্বাধীন সাংবাদিকতা, তথ্য যাচাই ও গভীর পাঠের প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়।

মানুষের মেধা ও প্রযুক্তির সক্ষমতার মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। বরং প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে তা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকে প্রসারিত করে– ধীরে ধীরে প্রতিস্থাপন না করে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি প্রযুক্তি ব্যবহার করব কি না, তা নয়; প্রশ্ন হলো প্রযুক্তি কি আমাদের জন্য কাজ করবে, নাকি আমরা ধীরে ধীরে প্রযুক্তির অভ্যাসের জন্য কাজ করতে শুরু করব? এই সীমারেখা নির্ধারণের দায়িত্ব ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি দায়িত্বশীল গণমাধ্যম– সবার। ■

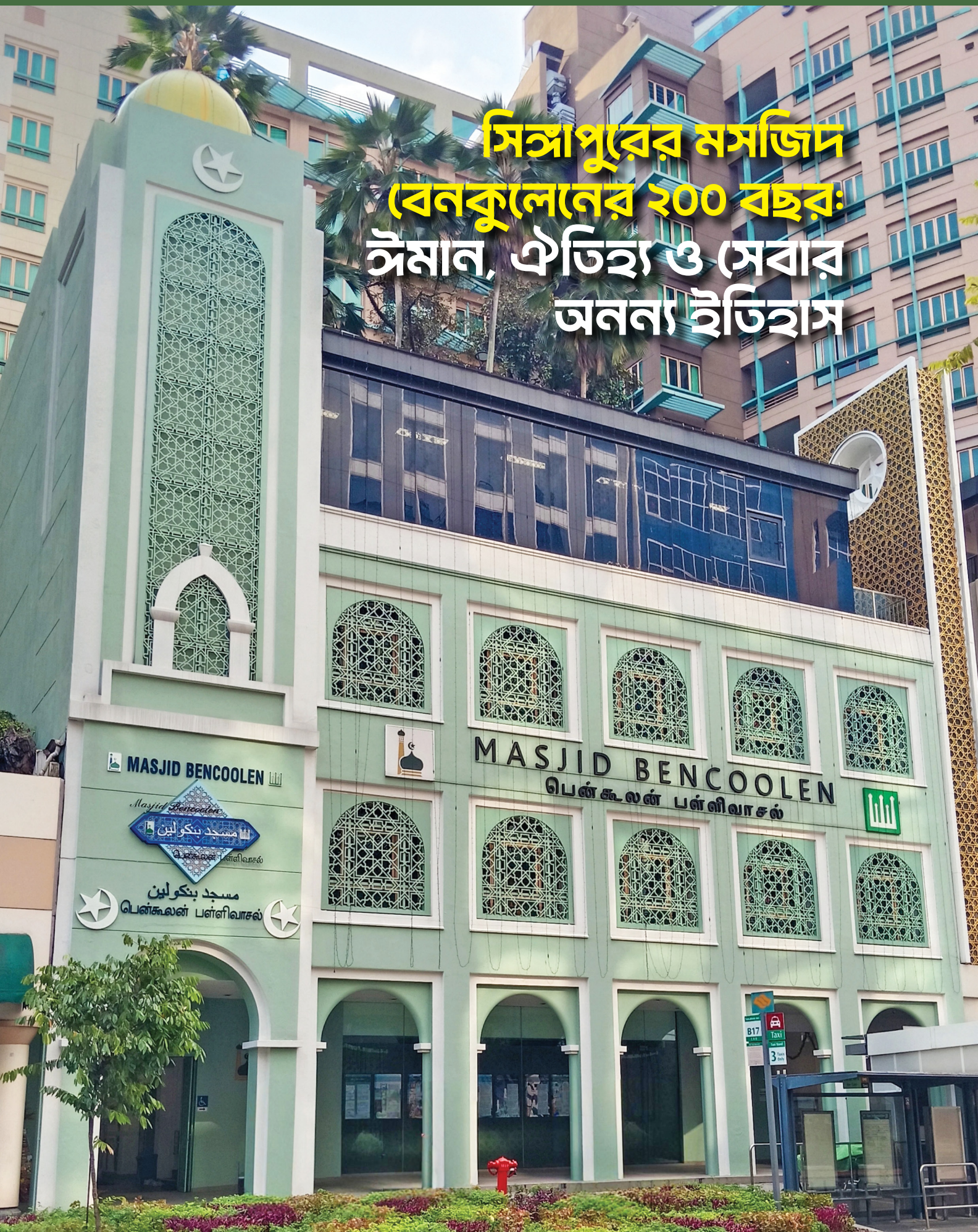

সিঙ্গাপুরের মসজিদ বেনকুলেনের ২০০ বছর: ঈমান, ঐতিহ্য ও সেবার অনন্য ইতিহাস

আল-উম্মাহ ডেস্ক

সারসংক্ষেপ : ১৮২৫ সালে ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও বসতি স্থাপনকারীরা ইবাদত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ বেনকুলেন প্রতিষ্ঠা করেন। দুই শতাব্দী ধরে মসজিদটি সিঙ্গাপুরের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও আত্মিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক মসজিদ বেনকুলেন তার ২০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। দুই শতাব্দী ধরে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চর্চা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জনসেবায় অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এই বার্ষিকী বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ উপলক্ষে মসজিদটির ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় বিভিন্ন প্রজন্মের অবদানকে সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি ১৮২৫ সাল থেকে মসজিদটির পথচলার ইতিহাস তুলে ধরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

গত ১৮ অক্টোবর-২০২৬ দেশটির সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইসলামিক রিলিজিয়াস কাউন্সিল অব সিঙ্গাপুর (মাজলিস উগামা ইসলাম সিঙ্গাপুরা–মুইস) জানায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মসজিদ বেনকুলেন মুসলিমদের ইবাদতের স্থান, সামাজিক মেলবন্ধনের কেন্দ্র এবং আত্মিক পরিচয় গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে।

২০০ বছর উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুসলিমবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রমন্ত্রী জাকি মোহাম্মদ, মুইসের সভাপতি মোহাম্মদ সা'আত আবদুল রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা, স্বেচ্ছাসেবক, দাতা ও স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

ঐতিহাসিক শিকড়

মুইসের তথ্য অনুযায়ী, মসজিদ বেনকুলেনের ইতিহাস সিঙ্গাপুরের প্রাথমিক ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ১৮২৫ সালে ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও বসতি স্থাপনকারীরা ইবাদতের স্থান এবং সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হিসেবে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন।

গত দুই শতাব্দীতে সিঙ্গাপুরের ব্যাপক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে মসজিদ বেনকুলেন। একই সঙ্গে এটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রজন্মের মুসল্লি ও তাঁদের পরিবারকে সেবা দিয়ে এসেছে। মসজিদটির কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ইসলামি শিক্ষা, সামাজিক উদ্যোগ ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এসব কার্যক্রম মসজিদ ও আশপাশের সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রজন্মের দায়িত্ব

মুইসের বিবৃতিতে মোহাম্মদ আবদুল জলিলের অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়। তিনি ভারতের চেন্নাই থেকে ছোট শিশু হিসেবে সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন। মসজিদ বেনকুলেনের সঙ্গে তাঁর গড়ে ওঠে গভীর সম্পর্ক। এখানেই তিনি খুঁজে পান আপনত্ব, সামাজিক বন্ধন ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার অনুভূতি।

যে প্রতিষ্ঠান তাঁকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল, পরবর্তী সময়ে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকে তিনি মসজিদ ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অবৈতনিক চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি মসজিদটির সহ-সভাপতি বা ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে প্রশাসনিক কার্যক্রমে অবদান রাখছেন।

মুইসের মতে, তাঁর এই পথচলা সেবা, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণের প্রতি অঙ্গীকারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব মূল্যবোধই প্রজন্মের পর প্রজন্ম মসজিদটিকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত রাখতে সহায়তা করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে জাকি মোহাম্মদ ইসলামের 'আমানাহ' ধারণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আমানাহ বলতে বিশ্বাস, আমানত রক্ষা, যত্ন ও দায়িত্ববোধকে বোঝায়। তিনি বলেন, মসজিদ বেনকুলেনের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠার পেছনে এসব মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।



সিঙ্গাপুরের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ বেনকুলেন ১৮২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮ অক্টোবর মসজিদটি তার ২০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে।

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, মসজিদটির ঐতিহ্যকে শুধু অতীত থেকে পাওয়া কোনো উত্তরাধিকার হিসেবে দেখলে চলবে না। বরং এটি একটি চলমান দায়িত্ব, যা প্রতিটি প্রজন্মকে গ্রহণ করতে হবে, যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

জাকি মোহাম্মদ মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি তরুণদের সহায়তা অব্যাহত রাখার, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার এবং আগামী ২০০ বছর ও তার পরেও মসজিদটিকে সবার জন্য উন্মুক্ত ও স্বাগতপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে রাখার আহ্বান জানান।

স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ

২০০ বছর উদযাপনের অংশ হিসেবে মসজিদটির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিকাশের ধারাবাহিকতা নথিভুক্ত করে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটির নাম মসজিদ বেনকুলেন: ২০০ ইয়ার্স–সেলিব্রেটিং টু সেঞ্চুরিজ অব ফেইথ অ্যান্ড সার্ভিস সিন্স ১৮২৫।

১৮২৫ সাল থেকে মসজিদটির দুই শতাব্দীর পথচলা, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি এর অবদান এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রজন্মের ভূমিকা তুলে ধরাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

তরুণদের জন্য নতুন কর্মসূচি

নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য 'নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক রিট্রিট' (প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা)-সহ নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা আরও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর সহায়তায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে উদারতা, সহমর্মিতা, যত্ন ও পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দুই শতাব্দীর ইতিহাস পেরিয়ে মসজিদ বেনকুলেনের এই উদযাপন শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নয়; বরং সিঙ্গাপুরের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ঐতিহ্য, সামাজিক সংহতি এবং প্রজন্মান্তরে সেবার অঙ্গীকারেরও প্রতিফলন। ■



বুরকিনা ফাসোয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করে বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা চালু

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোয় প্রচলিত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে তরুণীদের মেধা ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতাকে উৎসাহিত করার এক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে দেশটিতে চালু হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতা। এর মূল লক্ষ্য–নারীদের বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা এবং গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের মতো জটিল বিষয়ে তাদের দক্ষতা তুলে ধরা।

দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের ৮৪ জন তরুণীর অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে 'হাকিলি মুসো' নামের এই বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই ২০২৬ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাধ্যমিক সমাপনী সনদ অর্জন করেছেন। প্রতিযোগিতায় নাম লেখানোর আগে তাদের এক সপ্তাহের একটি বিশেষ প্রস্তুতি পর্বে অংশ নিতে হয়। এরপর গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ের ওপর পরীক্ষা নেওয়া হয়।



প্রতিটি বিষয়ে সেরা পাঁচজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারীরা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ২০ লাখ সিএফএ ফ্রাঁ (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪ লাখ ১৭ হাজার টাকা), একটি করে মোটরসাইকেল ও বহনযোগ্য কম্পিউটার (ল্যাপটপ)সহ আকর্ষণীয় বিভিন্ন উপহার।

বিজ্ঞানচর্চায় নারীদের উৎসাহিত করার উদ্যোগ

আয়োজকদের মতে, এই প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান বিষয়ে প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ধারণা ভেঙে দেওয়া। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের মতো বিষয়গুলো কেবল পুরুষদের জন্য–এমন ভুল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান তারা। তরুণীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞানশিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

প্রতিযোগিতা সমাপ্তির কয়েক দিন পর বিজয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ট্রাওরে। দেশটির সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২১ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত প্রায় এক ঘণ্টার ওই বৈঠকে বিজ্ঞান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ পেশা নিয়ে তরুণীদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি।

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা স্থগিতের সিদ্ধান্ত

বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা আয়োজনের পাশাপাশি বুরকিনা ফাসোতে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুন করে ভাবছে সরকার। এসব অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নতুন নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রণয়নের কাজ চলছে। এর অংশ হিসেবে দেশটির ভূখণ্ডে আয়োজিত সব ধরনের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

২০২৬ সালের ৮ জুন দেশটির যোগাযোগ, সংস্কৃতি, কলা ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের সব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ওপর এই স্থগিতাদেশ জারি করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পরিচালনায় আরও কঠোর ও সমন্বিত নিয়ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৃহত্তর সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, এই উদ্যোগ প্রগতিশীল বিপ্লবের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশটির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। নতুন বিধিমালায় বুরকিনা ফাসোর সাংস্কৃতিক পরিচয়, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করার বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে।

নতুন নিয়ন্ত্রক কাঠামো চূড়ান্ত ও গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত দেশটিতে কোনো সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হবে না। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পুরো দেশজুড়ে তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভূয়সী প্রশংসা

বিজ্ঞানভিত্তিক এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মানুষের মাঝেও ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। 'টেলস অব আফ্রিকা' নামের একটি ফেসবুক পেজে গত ১১ অক্টোবর এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট প্রকাশিত হয়। সেখানে অনেকেই তরুণীদের মেধা ও শিক্ষাগত অর্জনকে মূল্যায়ন করার এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন।

ওবান রেনাটা নামের এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, তিনি সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলেন এবং এই উদ্যোগ তাঁর সেই ধারণাকে আরও দৃঢ় করেছে। অস্কি জিজি লিখেছেন, উদ্যোগটি তাঁর ভীষণ ভালো লেগেছে এবং অন্য দেশের নেতারাও যেন এই পথ অনুসরণ করেন। এছাড়া ডার্লিংটন মওয়াজা প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য করেন, তিনি সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এসব প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে যে, তরুণীদের মেধা ও শিক্ষাগত অর্জনকে সামনে নিয়ে আসার এই ধারণাটি বুরকিনা ফাসোর গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই আশা করছেন, অন্যান্য দেশও বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য উদ্‌যাপনে এমন সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বুরকিনা ফাসোর এই বহুমুখী পদক্ষেপে একদিকে যেমন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় শৃঙ্খলার আনার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চায় তরুণীদের অংশগ্রহণ ও সাফল্যকে মূলধারায় নিয়ে আসার আন্তরিক প্রচেষ্টাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ■